মার্কসবাদী পথ

৩৫ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বিপ্লবী পার্টির বিকাশে গণ লাইন
সূর্যকান্ত মিশ্র

ভারতের ধারণাকে বাঁচাতে হবে
ইরফান হাবিব

জাত ও শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা
অমর ফারুকি

একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজি: মার্কস থেকে পিকেটি
এম এম আকাশ

জনসংখ্যা-তত্ত্বের গৈরিকীকরণ
সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেবারের নেতৃত্বে করবিন

Regd. No. RN/37318/81

মার্কসবাদী পথ

৩৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

সম্পাদক

সূর্যকান্ত মিশ্র

সহযোগী সম্পাদক

দেবাশিস চক্রবর্তী

ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

দাম : পনেরো টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

বিপ্লবী পার্টির বিকাশে গণ লাইন
সূর্যকান্ত মিশ্র ৭

ভারতের ধারণাকে বাঁচাতে হবে
ইরফান হাবিব ১২

জাত ও শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা
অমর ফারুকি ২১

একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজি: মার্কস থেকে পিকেটি
এম এম আকাশ ২৯

জনসংখ্যা তত্ত্বের গৈরিকীকরণ
সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪

আন্তর্জাতিক : লেবারের নেতৃত্বে করবিন
শান্তনু দে ৭০

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে দেবাশিস চক্রবর্তী কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন) থেকে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

সমুখপানে

বিপ্লবী পার্টি পথ চলবে গণলাইনে। সিদ্ধান্ত কলকাতা প্লেনামে। ২৭-৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৫। প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবন। সি পি আই (এম)-র সাংগঠনিক প্লেনাম। একুশতম পার্টি কংগ্রেসের নির্দেশ। সময়সীমার মধ্যেই সুচারুভাবে সম্পন্ন প্লেনামের কাজ। শেষে সিদ্ধান্ত। বিপ্লবী পার্টি হিসাবে গণলাইন অনুসরণ করে জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যেই মনঃসংযোগ করবে পার্টি। গণলাইন গ্রহণ করে পার্টির স্বাধীন শক্তি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সামর্থ্য দ্রুত বৃদ্ধি করাই হবে লক্ষ্য।

পার্টির সাংগঠনিক সক্ষমতাকে বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলার জন্য শক্তিশালী, দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত করাই প্লেনামের সংকল্প। গৃহীত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক লাইন অনুযায়ী পার্টির নিজস্ব শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে আরও শক্তিশালী গণসংগ্রাম গড়ে তুলেই তা করা হবে। এই লাইনের লক্ষ্য, ভারতীয় জনগণের মধ্যে শ্রেণি শক্তিসমূহের ভারসাম্য বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অনুকূলে– যা কিনা জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পূর্ববর্তী ধাপ– পরিবর্তন করা। এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়া।

জরুরি প্রয়োজন বাম ঐক্য শক্তিশালী করা। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা। যে ফ্রন্ট শুধুমাত্র নির্বাচনী মোর্চা নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীগুলিকে জনবিচ্ছিন্ন করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের লড়াইয়ে যাকে গড়ে তুলতে হবে সংগ্রামী জোট হিসেবে। কার্যকরভাবে রূপায়ন করতে হবে যুক্তফ্রন্টের কৌশলকে। যাতে যৌথ আন্দোলনের ভিত্তিতে ঐক্য ও সংগ্রামের উভয় দায়িত্বই পালন করা যায়। এতে পার্টি ঘনিষ্ঠ হতে পারবে শোষিত শ্রেণিগুলির সঙ্গে, যে শ্রেণিগুলি এই মুহূর্তে বুর্জোয়া দলগুলির প্রভাবের অধীন।

শ্রেণি ও গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে খেতমজুর, গরিব কৃষক, মধ্য কৃষক, অ-কৃষি ক্ষেত্রের গ্রামীণ শ্রমিক, কুটির শিল্পী এবং গ্রামীন দরিদ্রদের অন্যান্য অংশগুলিকে একজোট করে জমিদার এবং গ্রামীন ধনীদের আঁতাতের বিরুদ্ধে গঠন করতে হবে একটি ব্যাপক মঞ্চ। সেইসঙ্গেই মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করে, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক প্রথায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করে,

ট্রেড ইউনিয়ন, যুব, মহিলা প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এলাকা-ভিত্তিক সংগঠন। বস্তি/স্থানীয় স্তরে সংগঠিত করতে হবে শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের। গঠন করতে হবে পাড়া-মহল্লা-বস্তি কমিটি। পাশাপাশি জোরদার করতে হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে কাজকর্ম, বিশেষত মতাদর্শগত প্রশ্নে কর্মতৎপরতাকে। এজন্য গঠন করতে হবে বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ। যেমন নাগরিক মঞ্চ, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম/আন্দোলন (অ্যাকশন) প্রসারিত করার মঞ্চ, বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলির জীবন ও কাজকর্ম সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে মঞ্চ। জোরদার করা প্রয়োজন আবাসিক সমিতি, পেনশনভোগীদের সমিতি ও পেশাজীবী সংগঠনগুলিতে কর্মতৎপরতা।

প্লেনামে অন্যতম মুখ্য বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে গণলাইন অনুসরণ করার কথা। সালকিয়া প্লেনামে বলা হয়েছিল 'গণবিপ্লবী পার্টি' গঠনের কথা। কলকাতা প্লেনামে গণলাইন অনুসরণকারী বিপ্লবী পার্টির অর্থ হলো, পার্টির বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে গণভিত্তির বিকাশ ঘটানো। আমাদের পার্টি শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী পার্টি। যারা সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত জনগণকে সমবেত করতে চায়। সমাজের আমূল রূপান্তরের লক্ষ্যে। এই চরিত্রের প্রশ্নে কোনও আপস নয়। কিন্তু কোন লাইন অনুসরণ করে আমরা এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হব? গণলাইন-ই সেই পথ। গুণগত মান ছাড়া গণসংগ্রাম ও শ্রেণি আন্দোলনের বিকাশ ঘটানো যাবে না। সেই কারণেই জোর দেওয়া হয়েছে গণলাইন অনুসরণ করে পার্টির গণভিত্তি সম্প্রসারিত করার ওপরে। পার্টি সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির জন্য প্রয়োজন হলো সদস্যদের গুণগত মান বৃদ্ধি। যা গণভিত্তির প্রসারে সাহায্য করতে পারে। পার্টির গণভিত্তির প্রসারে সাহায্য করতে পারে গণলাইন। সেকারণেই জোর দেওয়া হয়েছে গণলাইন গ্রহণের ওপর। যার অর্থ পার্টি সদস্যদের মানের উন্নতি ঘটানো। তাঁদের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সক্ষমতা বৃদ্ধি। এমন এক শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি, যার গণভিত্তি রয়েছে– তা গঠন করার ওপরেই গুরুত্ব। বিপ্লবী চরিত্র এবং গণভিত্তি উভয় উপাদানই থাকছে বহাল।

প্লেনামের ডাক: সারা দেশে গণভিত্তির প্রসারের মধ্য দিয়ে গড়তে হবে আরও শক্তিশালী সি পি আই (এম)। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলো দৃঢ়পদে। গণলাইন সম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলো সমুখপানে।

বিপ্লবী পার্টির বিকাশে গণ লাইন

সূর্যকান্ত মিশ্র

সিপি আই (এম)-র কলকাতা প্লেনাম থেকে সর্বভারতীয় গণভিত্তি সম্পন্ন পার্টি গড়ে তোলা ও গণ লাইনের ভিত্তিতে চলা বিপ্লবী পার্টি গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৯৬৪ সালে পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচী ছিলো শ্রেণী সংগ্রামের কর্মসূচী, এই সঙ্গেই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে এগোনোর আহ্বান জানানো হয়েছিল। সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ থেকে মুক্ত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যও সেই কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হয়েছিল। ওই কর্মসূচী ছিলো সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল।

১৯৬৭ সালে বর্ধমান প্লেনামে মতাদর্শগত প্রশ্নে পার্টির অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়। নতুন পরিস্থিতিতে পার্টির সাংগঠনিক কর্তব্য সম্পর্কে দলিলও সেই সময়েই তৈরি করা হয়। কিন্তু পার্টির কাজের ধারায় সংশোধনবাদী ঝোঁক থেকে গিয়েছিল। ১৯৬৮-তে কালিকটে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে সংশোধনবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী এই ঝোঁকগুলিকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। অমৃতসরে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে 'গণপার্টি' গড়ে তোলার যে আহ্বান দেওয়া হয়েছিল তাতে পার্টি সংগঠনের বিপ্লবী চরিত্র ক্ষুণ্ণ হবার বিপদ বড় আকারে সূচিত হয়। কালিকট প্রস্তাবের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে সংশোধনাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে পার্টির রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইন রূপায়ণ করার উপযোগী পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যক শর্ত। পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকের শুরু থেকেই আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস, পরে সারা দেশে জরুরী অবস্থা জারির পরে একথা মনে করা হয়েছিল যে সংসদীয় গণতন্ত্র হয়তো আর ফিরে আসবে না। পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনে এই ধারণার প্রভাব পড়ে। তেমনই পার্টি সংগঠনের অভিমুখ কী হবে, তাতেও এর প্রভাব পড়েছিল। শাসক শ্রেণীর দলগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধকে খাটো করে দেখা হয়েছিল। পরে তা সংশোধিত হয়। ১৯৭৭-এ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঠিক রণকৌশল নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রে একটানা ৩০ বছরের কংগ্রেসের শাসনের অবসান ঘটে, জরুরী অবস্থার অবসান হয়। নতুন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট, পরে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট, কেরালায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারও গড়ে ওঠে।

১৯৭৭-র পরে পার্টির মর্যাদা, গণভিত্তি, জনসমর্থন, রাজনৈতিক প্রভাব যেভাবে বাড়ছিল পার্টির সাংগঠনিক প্রসার তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। ১৯৭৩-এ মজফফরপুরে সংগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবে লাগাতার বা সংলগ্ন এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। শক্তিশালী এলাকার সংলগ্ন অঞ্চলে পার্টি গঠনের এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যহীন জোর দেওয়ায়

সারা ভারতে পার্টির প্রসারের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭৮-এ সালকিয়া প্লেনাম কালিকট প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা ও মজফফরপুর প্রস্তাবের ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে সঠিক ভাবে পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিল। পার্টির সর্বভারতীয় প্রসার, রাজনৈতিক প্রভাবকে সাংগঠনিক শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণ বিপ্লবী পার্টি গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে সালকিয়া প্লেনামের নির্দেশ কতদূর কার্যকরী হয়েছে তার একটি পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তী কংগ্রেসগুলির রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টেও সেই পর্যালোচনা নিয়মিত ভাবেই করা হয়েছে।

সালকিয়া প্লেনামের ৩৭ বছর পরে একুশতম কংগ্রেসে এই সময়কালে, বিশেষ করে গত আড়াই দশকে বিশ্বে এবং দেশে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি হয়েছে তার প্রভাব পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা করেছে। তখনই ঠিক হয় সংগঠন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য প্লেনাম হবে।

কলকাতা প্লেনামে সংগঠন সংক্রান্ত যে রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে পার্টির বিপ্লবী সত্বা, মর্মবস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সালকিয়া প্লেনামের পর থেকে পার্টির সদস্যসংখ্যা, গণসংগঠনের সদস্যসংখ্যা প্রায় ১০গুণ বেড়েছে। কিন্তু পার্টির জনসমর্থন, গণভিত্তি বাড়েনি, বরং হ্রাস পেয়েছে। যেটুকু প্রসার ঘটেছে তা গণ পার্টির চেহারা নিয়েছে। সালকিয়া প্লেনামে গণ বিপ্লবী পার্টির যে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল তা ভুল ছিলো না। পার্টির বৃদ্ধি প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু একটি সময়ের পরে গুণগত মান বজায় রেখে প্রসারের কাজ ব্যাহত হয়েছে। গুণগত মান বজায় না থাকায় সারা ভারতে পার্টির পরিমাণগত বৃদ্ধিও শেষ পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারিত করার কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির সমস্যা বহুবার আলোচিত হয়েছে। পার্টির প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে যা কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৩সালেই ত্রুটি সংশোধনের অভিযান শুরু করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটিও ত্রুটি সংশোধনের দলিল গ্রহণ করে। সেইসব দলিলে গুণগত মানের অবক্ষয়ের কথা আলোচিত হয়েছিল। পার্টির অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালিত হলেও তা পুরোপুরি সফল হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটেই কলকাতা প্লেনাম থেকে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবী পার্টি গঠনের প্রথম শর্তই হলো পার্টির সদস্যপদের গুণমান। রাজনৈতিক-মতাদর্শগত ভাবে সমৃদ্ধ এবং সাংগঠনিক ভাবে শৃঙ্খলাপরায়ন ও কর্মদক্ষ সদস্যরা ছাড়া পার্টির প্রসারের কাজ সফল হতে পারে না। কিন্তু প্লেনামের রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে পার্টি সদস্যদের প্রয়োজনীয় গুণমান বজায় থাকছে না। এক্ষেত্রে পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ও শিথিলতা অন্যতম কারণ। অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ায় এই শিথিলতা দূর করতে হবে। সহায়ক গ্রুপের মাধ্যমে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পার্টি সদস্যদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দায়িত্ব পালন করেন না, এমনকি ন্যূনতম দায়িত্বও পালন করেন না। পার্টির গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত পাঁচটি ন্যূনতম দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে পার্টি সদস্যপদের স্ক্রুটিনি করতে হবে। এগুলি হলো: সদস্যপদের চাঁদা ও লেভি প্রদান, শাখার সভায় নিয়মিত উপস্থিতি, পার্টির ক্লাস, রাজনৈতিক প্রচার, সংগ্রাম আন্দোলনে সন্তোষজনক অংশগ্রহণ, গণফ্রন্টের সদস্য হয়ে গণফ্রন্টে কাজ, পার্টির পত্রপত্রিকা পাঠ ও গ্রাহক হওয়া। পার্টিকে নিষ্ক্রিয় সদস্যদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। পার্টি সদস্যপদের মুখ্য মাপকাঠি হবে শ্রেণী ও গণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ।

পার্টির শ্রেণী ও সামাজিক উপাদানের উন্নতি ঘটানোর বিষয়েও প্লেনাম গুরুত্ব দিয়েছে। পার্টি সদস্যদের শ্রেণী গঠনে দেখা যাচ্ছে সারা ভারতের বিচারে পার্টি সদস্যদের ৮১.৩শতাংশ এসেছে শ্রমিকশ্রেণী, গরিব কৃষক, খেতমজুরদের মধ্যে থেকে।

কিন্তু সব রাজ্যে এই ভারসাম্য সমান নয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীগুলি থেকে আসা পার্টি

সদস্যদের শতাংশ ৬২.৯৩। তফসিলি জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকেও পার্টি সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির হার একেক রাজ্যে একেক রকম। পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক রাজ্যেই এই হার সন্তোষজনক নয়।

তরুণদের মধ্যে পার্টি গঠনের কাজে ঘাটতির কথা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। গড়ে গোটা দেশে পার্টি সদস্যদের মধ্যে তরুণদের হার ২০শতাংশ। কিন্তু অনেক রাজ্যে কমে যাবার প্রবণতা রয়েছে, অনেক রাজ্যে তরুণদের অনুপাত বেশ খারাপ। পশ্চিমবঙ্গেও পার্টি সদস্যদের ১৩.৫শতাংশ তরুণ, যা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

শ্রেণী, সামাজিক বিন্যাস এবং তরুণদের ক্ষেত্রে শুধু সদস্যপদেই নয়, পার্টি কমিটি এবং নেতৃত্বে তাদের অংশ আদৌ সন্তোষজনক নয়। শ্রেণী বিন্যাসের দিক থেকে সমগ্র পার্টি সদস্যপদে মৌলিক শ্রেণীগুলির অবস্থান এবং রাজ্য ও জেলা কমিটি সদস্যদের সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতি দূর করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণী, খেতমজুর এবং গরিব কৃষকদের মধ্যে থেকে ক্যাডারদের নেতৃত্বদায়ী কমিটিতে উন্নীত করার জন্য ও পদক্ষেপ নিতে হবে। একই ভাবে সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিও দূর করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পার্টির সব স্তরে তরুণদের নেতৃত্বে উন্নীত করার বিষয়ে জোর দিতেই হবে।

পার্টির কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে গঠিত। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ হলো আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব। মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে গণতন্ত্র বেশি না কেন্দ্রিকতা বেশি। প্রশ্নটাই ভুল। পার্টিতে গণতন্ত্র প্রসারিত হলেই কেন্দ্রিকতা শক্তিশালী হয়। আন্তঃ পার্টি গণতন্ত্রের মর্মবস্তু হলো পার্টির নীতি ও কাজের সমস্ত বিষয়েই পার্টি ইউনিটে খোলামেলা আলোচনা হবে। কমিউনিস্ট পার্টির গণতন্ত্র হলো সজীব যৌথ কাজের গণতন্ত্র। শুধু নেতৃত্বকে নির্বাচনই নয়, পার্টির নীতি সম্পর্কে পার্টি সদস্যদের আলোচনা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের গণতন্ত্র। আন্তঃ পার্টি গণতন্ত্র যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রগত নেতৃত্ব সাধারণ পার্টি সদস্যদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সিদ্ধান্ত কার্যকরী ভাবে রূপায়ণ হয়। অন্যদিকে, নেতৃত্ব দুর্বল হলে পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র প্রসারে কুণ্ঠা থাকে। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার মানসিকতা তৈরি হয়। উদারবাদও প্রশ্রয় পায়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লঙ্ঘণ মোকাবিলা করা যায় যদি আন্তঃ পার্টি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিয়ে শক্তিশালী করা যায়। শুধু কাজের রূপায়ণের বিষয়ে নয়, নীতিগত বিষয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পার্টি সদস্যরা যাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পার্টি সংগঠনের জন্য এবং গণ সংগঠনে কর্মরত পার্টি সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। গণ সংগঠনের জন্য এই নীতি নয়। গণ ফ্রন্টের কার্যকলাপ পরিচালিত হবে তাদের সংবিধান, নিয়মবিধি মোতাবেক। পার্টি সদস্যদের তাঁদের কাজের মাধ্যমে গণসংগঠনের সদস্যদের আস্থা অর্জন করতে হবে, পার্টি থেকে 'ম্যানডেট' নিয়ে গিয়ে গণসংগঠনে কাজ করা চলে না। গণ সংগঠনের স্বাধীন কর্মধারাকে ব্যাহত করে এমন হস্তক্ষেপ থেকে সরে আসতেই হবে। অন্যথায় তাদের ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠনে পরিণত হয়ে ওঠাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেন বুঝতে পারেন যে, গণসংগঠনগুলি হলো স্বাধীন গণসংগঠন এবং তা গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করে।

বিপ্লবী পার্টি গঠনের স্লোগান বাস্তবায়িত হতে পারে না শ্রেণী সংগ্রাম, গণ সংগ্রাম গড়ে না তুলে। শ্রেণী শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করতে হবে। স্থানীয় স্তর থেকে ওপরে আন্দোলনকে প্রসারিত করতে হবে। ওই আন্দোলনের মধ্যে থেকেই পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চলবে। সংগ্রামের প্রতিফলন পার্টিতে ঘটবে, না হলে পার্টির বৈপ্লবিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না।

বিশেষ করে গত আড়াই দশকে উদারনীতির প্রভাব পড়েছে শ্রেণীগুলির ওপরে। সামাজিক বিন্যাস ও শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কেও তার গুরুতর প্রভাব পড়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রভাবের সমীক্ষা করতে গ্রুপ গঠন করেছিল। তাদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্র, শ্রমিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও শহরবাসীদের মধ্যে কাজের ধারার পরিবর্তন করার বিষয়ে প্লেনাম দিকনির্দেশ করেছে। খেতমজুর, গরিব কৃষক, মধ্য কৃষক, অ-কৃষি ক্ষেত্রের গ্রামীণ শ্রমিক, হস্তশিল্পী এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের অন্যান্য অংশগুলিকে একজোট করে জমিদার এবং গ্রামীণ ধনীদের আঁতাতের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক মোর্চা গঠন করার কথা বলা হয়েছে। মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করার পাশাপাশি সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক প্রথায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব, মহিলা প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এলাকা-ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে কাজকর্ম বিশেষত মতাদর্শগত প্রশ্নে কর্মতৎপরতাকে জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ যেমন, নাগরিক মঞ্চ, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম প্রসারিত করার মঞ্চ, বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির জীবন ও কাজকর্ম সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে মঞ্চ তৈরির কথা বলা হয়েছে।

উদারনীতিবাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে বাইরে লড়াইয়ের মতোই পার্টির মধ্যেও তার প্রভাবের বিরুদ্ধে বহুমাত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। বহুমাত্রিক কেননা উদারনীতিবাদের প্রভাব মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে রয়েছে। একদিকে ভোগবাদ, আত্মসর্বস্বতা, অন্যদিকে উত্তর আধুনিকতার দর্শনের মতো দিশাহীন দর্শন। পরিচিতিসত্তার রাজনীতির মতো বিষয় সামনে চলে আসছে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে চালু থাকা ধারণাকে নতুন করে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চাদপদ চিন্তাও উদারবাদের নতুন মোড়কে হাজির হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রয়োজন। মূল উপাদান মতাদর্শগত।

প্লেনামের আহ্বান হলো ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম)-কে শক্তিশালী করো। এখান থেকেই গণ লাইনের ধারণা আসছে। ভারতীয় জনগণ কোনো শ্রেণী বিবর্জিত ধারণা নয়। পার্টি কর্মসূচীতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে যে শ্রেণীগুলিকে সমবেত করার কথা বলা হয়েছে তাদেরই পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম) কাজ করবে। কমিউনিস্ট পার্টির মূল চরিত্র তা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী একা বৈপ্লবিক রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। মার্কস-এঙ্গেলসও বলেছিলেন, অন্যদের মুক্তি না দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী তার নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে না। পার্টি কর্মসূচীতে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা বলা হয়েছে। যার মর্মবস্তু হলো শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী এবং গরিব কৃষক ও খেতমজুর, এই মৌলিক শ্রেণীগুলির বিপ্লবী জোট। তার চারপাশে মেহনতী জনগণের অন্যান্য অংশকে সমবেত করতে হবে। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা এই লক্ষ্যে যাওয়ারই একটি ধাপ। ২১তম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইন বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রাথমিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক দিয়েই আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলা ও বিপ্লবী পার্টি গঠনের কাজ শুরু হয়। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গণ লাইন নেওয়ার অর্থ হলো জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এবং শ্রেণী ও গণ আন্দোলনের বিকাশে তাদের ইস্যুগুলিকে তুলে ধরা। প্লেনামের রিপোর্টে বলা হয়েছে সমস্ত স্তরের নেতৃত্বেরই কাজের ধারা পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গণ অভিমুখী কাজের ধারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই জনগণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের কথা বলেছি। গণসম্পর্ক, গণসংগ্রাম থেকে গণসংগ্রহের মত দশটি ‘গণ’ কাজের কথা আমরা বলেছি। গণ লাইনের কথা বললে মাও জে দঙের সেই উদাহরণের কথাই বলতে হয়: ‘জলের মধ্যে মাছ যেমন, জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের জীবনও সেই রকম’। পার্টির বেঁচে থাকা, সজীব কাজকর্ম নির্ভর করে জনগণের মধ্যে তার সক্রিয়তার ওপরে। অন্যথায় ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো অবস্থা হয়।

চেতনার মান স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়ে না। জনগণের মধ্যে চেতনা ও উন্নত মতাদর্শ নিয়ে যাবার দায়িত্ব কমিউনিস্টদের পালন করতেই হবে। সেই কাজ করতে হবে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই। সমস্ত স্তরের সংগঠনেই রুটিন, গতানুগতিক কাজের ধারা প্রবেশ করেছে। মানুষের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নেহাত বেঁচে থাকা মানে যেমন জীবন নয়, তেমনই শুধুমাত্র রোজকার নিয়মমাফিক কাজ করাই পার্টির কাজ হতে পারে না। জনগণের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা কী, স্থানীয় স্তরের দাবি কী, কোন পদ্ধতিতে লড়াই করলে মানুষের সমাবেশ ঘটানো যেতে পারে। জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সমস্ত জ্ঞানের আধার নন, আমাদের সবই জানা আছে এই বোধ থেকে মানুষের কাছে যাওয়া চলবে না। শুধু আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে মানুষের কাছে গেলে চলবে না। মতবিনিময় করা যেতে পারে, এমন ভাবে মেলামেশা জরুরী। পার্টির সর্বস্তরের কর্মী ও নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের এই পথেই চলতে হবে। জনগণের অভিজ্ঞতা ও তাদের চিন্তা অনেক সময়েই বিক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ থাকে। সেই অভিজ্ঞতাকে পার্টির মধ্যে নিয়ে এসে তাকে সম্পূর্ণতর করে ফের জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকবে। একেই গণ লাইন বলে অভিহিত করা হচ্ছে। বিপ্লবী পার্টির চলার পথ গণ লাইনের পথ। পার্টির সর্বস্তরেই গণ লাইন ও গণ অভিমুখী কাজের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পার্টির রাজনৈতিক লাইনের সঠিকতাও বিচার করতে হয় জনগণের অভিজ্ঞতার নিরিখেই।

ভারতের ধারণাকে বাঁচাতে হবে

ইরফান হাবিব

ভারতের ধারণা বিকশিত হয়ে চলেছে। আমি এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করতে চাই। ভারত কী করে জেগে উঠলো, কী করে তা বিকশিত হয়েছে এবং কীভাবে ভারত জাতিরাষ্ট্রের চেহারা নিয়েছে এবং আজ সেই জাতিরাষ্ট্রটি কোন বিপদের সামনে তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা আমাদের ইতিহাসের খুব খারাপ মুহূর্তে আছি। যুক্তিবাদী- যাঁরা বিজ্ঞানমনস্কতায় বিশ্বাস করেন- যেমন দাভোলকর, পানসারে, কালবুর্গি- তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। গোরক্ষার নামে মহম্মদ আখলাককে হত্যা করা হলো। ফলে, আমাদের দেশের সুনামকে টেনে মাটিতে নামানো হয়েছে। তাই আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এখনই দেখতে হবে আমাদের দেশ কী এবং কিভাবে দেশের পক্ষে সবচেয়ে ভালো ভূমিকা পালন করা যায়।

আমাদের মনে রাখা ভালো বি জে পি এবং তাদের অভিভাবক আর এস এস বলতে ভালোবাসে যে ভারত জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ঋগবেদের সময় থেকে। বাস্তবে না ঋক বেদ, না অপর তিন বেদ বা তার পরের ব্রাহ্মণ এমনকি উপনিষদের সময়েও ভারত শব্দটির উল্লেখ কোথাও নেই। ঋক বেদে কোনো ভৌগলিক অঞ্চলের উল্লেখও নেই; কেবল নদী এবং জাতির কথা রয়েছে। এমনকি 'সপ্ত সৈন্ধব' বা সাত নদী পাঞ্জাবকে বোঝাতো না তখন, যা পরে বোঝাতো, কেবল সেই নদীগুলিকে বোঝাতো যা থেকে সিন্ধুর উৎপত্তি। বৈদিক শ্লোক রচিত হতো কেবল পাঞ্জাব এবং আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চলে, সেখানে পরিযায়ী বিভিন্ন জাতি বসবাস করতো; ফলে 'দেশ' তো দূরের কথা এমনকি নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের ধারণাও ছিল না।

সাংস্কৃতিক বিকাশের সাথে রাজনৈতিক সত্তাগুলি প্রকাশ পায়। আমাদের দেশের নাম প্রথম পাওয়া যায় প্রাকৃত ষোলো মহা-জনপদে, যার মানে ষোলটি মহা প্রদেশ, তার উল্লেখ মেলে ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পুঁথিতে। মনে রাখা ভালো, ষোলো শব্দটি প্রাকৃত এবং হিন্দি, উর্দু সহ আমাদের বিভিন্ন ভাষায় প্রাকৃতের অবদান রয়েছে। মহা-জনপদ বলতে বোঝাতো কম্বোজ বা কাবুল থেকে পূর্ব বিহারের অঙ্গ পর্যন্ত তবে পুরোটাই সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর ভারতে: তখনও ভারত বলতে আমরা আজ যা বুঝি তা হয়নি। কিছু ধর্ম স্তোত্রে, আর্যাবর্ত শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মানে জ্ঞানীদের প্রদেশ এবং মনুস্মৃতিতে আর্যাবর্ত বোঝাতো হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত দেশকে। কিন্তু সেখানেও আজকের ভারতের বিরাট অংশেরই উল্লেখ নেই।

দেশ হিসেবে ভারতের ধারণাটি প্রথম প্রকাশ পায় মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়। ভারতের ইতিহাস চর্চা করেন যাঁরা তাঁরা জানবেন হয়তো যে মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে কান্দাহার এবং কাবুলের উত্তর অংশ থেকে কর্ণাটক ও অন্ধ্রে এবং সেগুলি ছিল প্রাকৃত, গ্রিক ও অ্যারামেইকে লেখা। এই রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা থেকেই ভারতের উৎপত্তি এবং

প্রথমে তার নাম ছিল জম্বুদ্বীপ যা অশোক তাঁর শিলালিপি (মাইনর রক এডিক্ট-১)-তে ব্যবহার করেছিলেন জাম ফলের দেশ অর্থে। ভারত শব্দের উল্লেখ মেলে ওড়িশায় প্রাকৃতে লেখা একটি শিলালিপি থেকে, হাতিগুম্ফায়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে কলিঙ্গ রাজা খরাবেলা এই শিলিলিপি তৈরি করেছিলেন। ফলে, দেশ হিসেবে ভারতের ধারণা বিকাশ পেতে শুরু করে এবং এখানে প্রচারিত বিভিন্ন ধর্ম যেমন বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণতন্ত্র এবং জৈনধর্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল পাওয়া যায়। প্রাকৃত, অন্তত আক্ষরিকভাবে, দেশের সর্বত্র ব্যবহার হয় বিভিন্ন ভাষাভাষির মধ্যে যোগসূত্র (লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা) হিসেবে।

বিদেশীদের অনেকেও এটিকে বিশেষ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টসম্পন্ন দেশ হিসেবে দেখতেন। মজার হলো, অনেক সময় বিদেশীরা অন্য কোনো দেশকে সেই দেশটির অধিবাসীদের তুলনায় সহজভাবে বুঝতে পেরেছেন। তার কারণ, তারা পার্থক্যটি বুঝতে পারে, যেমন ভারতীয় এবং পারসিকদের মধ্যে; পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে যেখানেই যাক তারা দেখছে কথা বলার মাধ্যম হিসেবে প্রাকৃত ব্যবহার হচ্ছে আর সংস্কৃত পুরোহিতদের ভাষা। ফলে, ইরানিরা প্রথম আমাদের 'হিন্দু' নাম দেয়, আর হিন্দু শব্দটি হলো সিন্ধু নদের পারসি রূপ। তাই, সিন্ধুর পূর্বে সব অঞ্চল হিন্দু এবং তা থেকেই ইন্ডিয়া-র উৎপত্তি।

গ্রিকরা এই 'হিন্দু'কে বলতো 'ইন্দু'। তারা 'হ' উচ্চারণ করতো না এবং চীনের মানুষদের কাছে ইন্ডিয়ার 'ইনতু' নামের উৎস একই। এরপর পারসি নাম 'হিন্দুস্তান' এসেছে। মনে রাখা দরকার সংস্কৃতে হিন্দুস্তান বলে কোনো শব্দ নেই। সংস্কৃতে স্থান মানে কোনো একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র। কিন্তু, পারসিতে 'স্তান' জুড়ে দেওয়া হয় কোনো নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চল বোঝাতে। সেই কারণেই সিয়েস্তান, গুরজিস্তান, হিন্দুস্তান এবং আরো এমন শব্দ এসেছে। খ্রীষ্টজন্মের পর চতুর্থ শতকেএই নাম ব্যবহার হয়েছে সাসানিদ শিলালিপিতে। তাই হিন্দু শব্দটি এবং এমন বিভিন্ন শব্দ এসেছে ভারতের বাইরে থেকে। যারা হিন্দুত্বের কথা বলে যা কিছু বিদেশী বর্জনের জন্য বলছেন, তারা ভুলে যান যে হিন্দু শব্দটি উৎসের বিচারে ইরানি এবং চতুর্দশ শতকের আগে সংস্কৃতে তা পাওয়া যায় না। সংস্কৃতে প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শিলালিপিতে যেখানে বিজয়নগরের সম্রাটরা নিজেদের 'হিন্দু রায়া সুরতরন' বা 'হিন্দু রাজাদের সুলতান' বলেছেন। তাই, আমাদের দেশ এবং নাম বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেয়, যা ইরানি থেকে আসা হিন্দু নামটিতেই ভালোভাবে বোঝা যায়। পরে সেই নাম ব্যবহার করতো ইরানি এবং আরব মুসলিমরা, অনেক পরে চতুর্দশ শতকে যা সংস্কৃতে জায়গা পায়।

আমি একথা বলছি কারণ এ থেকে বোঝা যায় যে দেশ হিসেবে ভারতের ধারণাটি প্রাচীন, পেরি অ্যান্ডারসন তাঁর বই 'দ্য ইন্ডিয়ান আইডিওলজি'-তে বলেছেন বিদেশীরা বিশেষত ইউরোপীয়রা আধুনিক কালে এই নাম দিয়েছেন, বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। এটি নির্দিষ্টভাবেই বিভ্রান্তিকর কারণ আরো একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় থাকায়: সত্যিই প্রাচীন সময় থেকে, এমনকি খ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকে ভারতের ধারণা ছিল, কিন্তু কখন থেকে ভারতের জন্য প্রেম, মানে দেশপ্রমের ধারণা এলো? আশ্চর্যের হলো, প্রাচীন ভারতে কখনো সংস্কৃতে কোনো শ্লোক রচিত হয়নি যেখানে ভারতের জন্য প্রেমের অভিব্যক্তি রয়েছে।

প্রথম দেশপ্রেমিক পদ্য, যেখানে ভারতের স্তুতি রয়েছে, ভারতীয়দের প্রশংসা রয়েছে তা হলো আমির খসরুর দীর্ঘ পদ্য ১৩১৮তে লেখা 'নুহ সিপিহির'। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমরা এই ঐতিহ্য হারাচ্ছি। কতজন আমির খসরুর লেখা পড়তে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন ইতিহাসে প্রথমবার ভারতের জয়গান রচিত হয়েছে? কেন আমির খসরু ভারতের প্রশংসা করছেন? প্রথমত আবহাওয়া, যা আমি মনে করি যথেষ্ট অস্বস্তিকর মন্তব্য, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার জীবজন্তু, তার নারী, তাদের রূপ এবং বিশ্বস্ততা। তারপরই তিনি ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলছেন। তিনি তাঁদের শিক্ষার প্রশংসা

করছেন, তিনি তাঁদের ভাষা সংস্কৃতের প্রশংসা করছেন। তিনি ভারতে কেবল ব্রাহ্মণদের দেখছেন না, মুসলিমদের সম্পর্কেও বলছেন। তিনি বলছেন, যারা পারসি বলে এবং যারা তুর্কি বলে তাদের সারা ভারতেই পাওয়া যাবে। তিনি কাশ্মীরি থেকে মাবারি, মানে তামিল, সব ভাষারই প্রশংসা করছেন। উত্তর ভারতই কেবল নয় দক্ষিণ ভারতেও যে যে ভাষা চালু ছিল তার তালিকা দিচ্ছেন তিনি। তিনি এগুলিকে বলছেন হিন্দাভি। তিনি আরো বলছেন যে সংস্কৃত ভাষা হলো শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের ভাষা। এবং কোরান যদি আরবিতে না লেখা হতো তিনি সংস্কৃতকেই আরবির চেয়ে বেশি পছন্দের বলতেন। তিনি এরপর বলছেন ভারত বিশ্বকে বহু কিছু দিয়েছে; পঞ্চতন্ত্রের গল্প, দাবা, সবচেয়ে আশ্চর্যের, তিনি বলছেন ভারত বিশ্বকে দশমিক সংখ্যা দিয়েছে যা পরিচিত আরবের সংখ্যা বা আন্তর্জাতিক সংখ্যা হিসেবে। তিনি তিনটি বক্তব্যেই ঠিক। এবং, দশমিক চিহ্ন দেওয়ার কথা খ্রীষ্টজন্মের পর চতুর্থ শতকে আর্যভট্ট তাত্ত্বিক বিচারে বলেছিলেন।

আরো ইতিহাসবিদ, অন্য লেখক, অন্য কবিরাও ভারতের প্রশংসা করেছেন কিন্তু এতো বিশদে নয়, এমন আবেগ নিয়ে নয়, অবশ্যই অন্যদের আমির খসরুর মতো ভাষায় এমন অসাধারণ দখলও রাখতে পারেননি। ১৩৫০সালে কবি ইসামি ভারতের প্রতি নিবেদিত পদ্যে লিখেছেন: " চোখ জুড়ানো হিন্দুস্তান ধন্য তুমি, তোমার ফুলের বাগানকে ঈর্ষা করে স্বর্গও।"

আমরা দেশপ্রেমিক পদ্য পেতে শুরু করছি এই সময়। যদিও সেসব পারসিতে লেখা এবং এখন ভারতীয়দের কাছে পারসি প্রায় মৃত ভাষা বলে বিশদে যাচ্ছি না।

মুঘল যুগে দেশপ্রম তীব্রতর হলো, বিশেষ করে আকবর এবং আবুল ফজলের মাধ্যমে। তাঁরা বললেন, ভারত একটি বিশেষ দেশ, ভারতে বহু ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে, তাই সহিষ্ণুতা অবশ্যই থাকা উচিত, একত্রিত সন্নিবেশ 'সুলহ-ই কুল' বললেন তাঁরা, যার অর্থ 'নিবিড়তম শান্তি'। বলা হলো যে, ঈশ্বরের মতোই রাজাকেও সবাইকে একই চোখে দেখতে হবে। কেবল আকবর বা আবুল ফজলই সেই ভাবনায় জোর দেননি, জোর দিয়েছিলেন যুবরাজ হিসেবে আওরঙ্গজেবও, ১৬৫৮তে রাজপুতদের সমর্থন পেতে তা বলছেন তিনি। বলা হলো, ঈশ্বর কি বৃষ্টি ঝরানো বা সূর্য ওঠানোর সময় মুসলিম এবং অ-মুসলিমদের মধ্যে ফারাক করেন? বৃষ্টি কি কেবল মুসলিমদের উপর ঝরে? সূর্য কি কেবল মুসলিমদের আলো দেয়, হিন্দু বা অ-মুসলিমদের দেয় না? তা'হলে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে রাজা কেন ভিন্ন বিচার করবেন?এই বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা না থাকলেও সহিষ্ণু রাষ্ট্রের ধারণা রয়েছে যা ভারতের সঙ্গে খাপ খায়। বারবারই সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানোর কথা বলা হয়েছে। জাহাঙ্গির বলছেন, তুরানে কেবল সুন্নিদের এবং ইরানে কেবল শিয়াদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো হয়। কিন্তু, ভারতে সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো হয়। ফলে, মুঘলদের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নতুন এই উপাদান সংযোজিত হয়েছে।

১৯২৮সালে 'দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অন ইন্ডিয়ান কালচার' বইয়ে ডঃ তারা চাঁদ বলেছেন পরপর দুই বৃহৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা দিল্লি সুলতানরাজ এবং মুঘল সাম্রাজ্য ভারতের সব অংশকে একত্রিত করে 'জাতীয় সংহতি'র বৃহত্তর ধারণা তৈরি করতে পেরেছিল। তাঁর বইটি পরে ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ফের প্রকাশ করে। তারা চাঁদ তাঁর এই বক্তব্যে সমানভাবে জোর দিয়েছেন ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস লেখার সরকারী দায়িত্ব পালনের সময়ও। যার একাংশ তিনি নিজে লিখেছিলেন, খানিকটা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৫৭সালের বিদ্রোহে এই রাজনৈতিক ভারতের ধারণাটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছিল। আধুনিক ভারত সম্পর্কে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জেনে থাকতে পারেন যে বেঙ্গল আর্মিতে বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে তার শুরু হয়েছিল। ১৩০হাজার সেনার বাহিনী, যা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ছিল, তার মধ্যে একশো হাজার বিদ্রোহে যোগ দেন যাঁদের অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্মণ সিপাহি। কিন্তু সেই সিপাহিরা কী বলতেন? 'চলো দিল্লিতে ভারতের সম্রাট বাহাদুর শাহের মাথায় মুকুট তুলে দিতে'। যাঁরা উর্দু জানেন তাঁদের বলবো দিল্লির বিদ্রোহীদের মুখপত্র 'দিল্লি উর্দু আখবর'

পড়তে। টানা পাঁচ মাস এই পত্রিকার মাধ্যমেই নিজেদের কথা বলতো বিদ্রোহী সেনারা এবং তাঁরা 'হিন্দুস্তান'র কথা বলতেন। তাঁরা সাদির উদ্ধৃতি দিতেন যিনি সব মানুষকেই এক করে দেখার কথা বলতেন- 'আয়জা-এ-এক-দিগর' এবং- 'তারা একে অন্যের অঙ্গ', একজন আঘাত পেলে অপরজনও পাবে। দিল্লি উর্দু আখবার পত্রিকায় ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে বিবৃতি দেওয়া হলো কারণ ওয়াহাবিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিমদের একযোগে বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল। বস্তুত, ওয়াহাবিরা ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। ঈদুজ্জোহার দিন জামা মসজিদ দখল করে গোরু জবাই দেওয়ার জন্য জোর করছিল। বিদ্রোহীদের নেতা বখত খান তাদের মসজিদ থেকে হটিয়ে দেন এবং হুঁশিয়ারি দেন যে জেদ ধরলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে।

সৈয়দ আহমেদ খান তাঁর 'সরকশি-ই-জিলা-বিজনোর' বইয়ে বলেছেন ১৮৫৭-র বিদ্রোহের জন্য সব ভারতবাসীই দায়ী এবং সঙ্গত কারণেই শাস্তি পেতে হয়েছে। শাস্তি সঙ্গত বা অসঙ্গত যা-ই হোক, ঘটনা হলো বিদ্রোহীরা ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন বলেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ জাফর যখন বন্দী শহীদদের স্মৃতিতে লিখেছিলেন:

অ্যায় জাফর কায়াম রহেগি যব তালাক ইকলিম-ই-হিন্দ,
আখতার-ই-ইকবাল ইস গুল কা চমকতা জায়েগা
(জাফর, যতদিন ভারত দেশটি থাকবে, ঝরে যাওয়া এই সব ফুল উজ্জ্বল থাকবে)

ভারতের ধারণা, রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, ১৮৫৭তেই ছিল। কিন্তু তা কি যথেষ্ট? ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ব্যর্থ যদি ধরা হয় অংশত তার কারণ ভারতের সব অংশে সমর্থন না থাকা। বেঙ্গল আর্মি বিদ্রোহ করলেও মাদ্রাজ এবং বম্বে আর্মি করেনি। ১৮৫৮ সালে ভিক্টোরিয়ার সনদের জবাবে বিদ্রোহীরা সরব হয়েছিলেন ভারতজুড়ে বিভিন্ন অংশে, মহীশূরে টিপু সুলতান থেকে পাঞ্জাবে সিংয়ের মতো দেশীয় রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের নেতারা সারা ভারতের কথা ভাবলেও বাস্তবে হিন্দুস্তানিভাষী এলাকার বাইরে বিদ্রোহ ছড়াতে পারেনি।

সত্যি বলতে, ভারতকে 'দেশ' (কান্ট্রি) থেকে 'জাতিরাষ্ট্রের' (নেশন) পর্যায়ে ওঠার জন্য আরো কিছু উপাদানের প্রয়োজন ছিল। এই রূপান্তরের জন্য দু'টি পর্বকে আমার গুরত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রথমত, এই বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিলো যে স্বাধীন এবং ব্রিটিশমুক্ত ভারত আলাদা। ব্রিটিশ শাসনের চেয়ে তা ভালো। রাজা রামমোহন রায় এবং সৈয়দ আহমেদ খানের মতো নিজেদের কাজের প্রতি আন্তরিক মানুষও মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন ভারতের পক্ষে শ্রেয়। মানুষের উপলব্ধিতে থাকার দরকার ছিল যে ব্রিটিশ শাসনের চেয়ে উন্নততর ভারত সম্ভব। ঠিক এই প্রশ্নেই দাদাভাই নওরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিচারপতি রানাডের মতো ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে ব্রিটিশরা ভারত শোষণ করছে। ১৮৭৪ থেকে ১৯০১, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 'মহান বৃদ্ধ' নওরজি ভারতকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে তা বোঝাতে লিখে গিয়েছেন। তাঁর বই 'পভার্টি অ্যান্ড দ্য আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' নামটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে। ব্রিটিশরা ভারতকে শুষে নিয়েছে, মুক্ত বাণিজ্যের নামে অব-শিল্পায়ন করেছে। দাদাভাই নওরজি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের পারসিদের নিয়ে ন্যূনতম ভাবতেন, দেখবেন তিনি লড়াই করছেন সব ভারতীয়ের জন্য, হিন্দু-মুসলিম-বাঙালি-পাঞ্জাবি। রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং সেই সময়েই লেখকদের প্রসঙ্গে আলোচনার সময় এই বিষয়টি মনে রাখা জরুরী। তাঁরা সব ভারতীয়ের হয়ে কথা বলছিলেন। যদিও তাঁদের বক্তব্য পৌঁছাতো ইংরেজি জানা মানুষের মধ্যেই কেবল, যারা সংখ্যায় অল্প। তাঁরা কৃষক, তন্তুজীবী, গরিব, বেকার সবার হয়ে বলছিলেন কিন্তু ইংরেজিতে লেখার কারণে অতি ছোট একটি গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিভাবে তাঁদের বক্তব্য আরো বেশি মানুষকে শোনানো যেতো? একটি উপায় ছিল সামাজিক সংস্কারের পক্ষে আন্দোলনে সমর্থন জানানো। প্রথম সরব হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যিনি পারসি, আরবি, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি এবং হিব্রু জানতেন। তাঁর প্রথম বই 'তুয়াফাতু আল মুয়াহহিদিন' পারসিতে

লেখা। ১৮২৮সালে তিনি বলেছিলেন ভারতীয়রা জাতে বিভক্ত হওয়ার কারণে দেশপ্রেমিক হতে পারে না। জাতের প্রতি আসক্তি থাকলে দেশপ্রেম কিভাবে সম্ভব? ফলে সমাজ সংস্কার আন্দোলন, নির্দিষ্টভাবে যা কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) শুরু করেছিলেন এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁকে আজ কার্যত ভুলে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই মানুষটিকে দেখুন, যিনি ১৮-২০বছর বয়সে লিখছেন অস্পৃশ্যতা বিলোপ হওয়া উচিত, ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ চালু হওয়া উচিত, নারীদের পুরুষদের সমান অধিকার থাকা উচিত উত্তরাধিকার এবং অন্য সব অধিকারের প্রশ্নে, মহিলাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হওয়া উচিত। তিনি নতুন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন যার সদস্যরা গোমাংস খেয়ে বোঝাতে চাইতেন যে তাঁরা কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন নন। কিন্তু, এটি ছোট দিক; বড় দিক হলো তাঁরা সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করতে পেরেছিলেন। সর্বত্র এই দাবি উঠেছিল- অস্পৃশ্যতার অবসান, নারীদের সমান অধিকার এবং আধুনিক শিক্ষা। ১৮৭০সালে কেশব চন্দ্র সেন বলেছিলেন, সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়েই জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে ভারত, যেহেতু এক জাতি হতে হলে জাত এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বেড়া ভাঙতে হবে।

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় বা যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে এখানে বলছি না। আমি কেবল উল্লেখ করবো গদর আন্দোলনের। (ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মির আগে) মহরাষ্ট্রে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং বাংলায় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছাড়া দেশে এই আন্দোলনেই একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি শহীদ হয়েছিলেন। ১৯১৩-১৫তে গদর আন্দোলনের জন্ম পাঞ্জাব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অভিবাসী পাঞ্জাবীদের মধ্যে। হিন্দু, মুসলিম এবং বিশেষ করে শিখরা ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন। গদর আন্দোলনের ডাকে সবচেয়ে বড় অভ্যুত্থান হয়েছিল সিঙ্গাপুরে ফিফথ লাইট ইনফ্যানট্রি-র মুসলিম সেনাদের মধ্যে। অভ্যুত্থান দমনের পর জনতাকে সন্ত্রস্ত করার জন্য তাঁদের পঁয়তাল্লিশ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু, মৃত্যুমুখেও তাঁদের সাহসী অভিব্যক্তিতে ব্রিটিশরা প্রকাশ্য দণ্ডদান থেকে ফয়দা তুলতে পারেনি। ১৮৫৭-র পর সেনাবাহিনীর এই বিদ্রোহই শহীদের সংখ্যায় সবচেয়ে বড়। ১৯১৪-১৫ সালের মধ্যে পাঞ্জাব এবং অন্যত্র হিন্দু, মুসলিম এবং শিখ মিলিয়ে ৫০জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু, গদর আন্দোলনের বেশ কিছু নথিপত্র যন্ত্রণার। মানুষের কম অংশই সমর্থন জানিয়েছিল। যে মানুষের কাছে তাঁরা আশ্রয় চেয়েছিলেন তারাই পুলিশকে জানিয়ে আসে। তাঁদের মৃত্যু অবহেলিত থেকেছে। কারণ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব তখনও সীমিত, খুব কম মানুষের কাছে ভারত জাতিরাষ্ট্র। এখানেই আমার মনে হয় প্রায় বিনা দ্বিধায় মানতে হবে যে মহাত্মা গান্ধীই সেই চরিত্র যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মানুষকে জড়াতে পেরেছিলেন এবং জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ভারতের প্রকাশ গতি পেতে শুরু করেছিল। ১৯১৩সালের আগে কি কখনও প্রায় ২০০জন ভারতীয় মহিলা, হিন্দু এবং মুসলিম মিলিয়ে, কারাবরণে তৈরি হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর নিপীড়নের প্রতিবাদে? ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদের নজির ছিল না। ১৯১৩তে ২হাজার খনি শ্রমিক ট্রান্সভালে মিছিল করলেন– দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের মহামিছিল। ভারতীয় ইতিহাসে এমন হয়নি! তার পেছনে কে ছিলেন? গান্ধী তা করেছিলেন এবং ভারতে আসেন ১৯১৫সালে কারণ এই আন্দোলনের পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী স্মাট বাধ্য হয়ে দেশীয়দের কর বাতিল করিয়েছিলেন, ভারতীয় বিবাহ আইনসিদ্ধ করিয়েছিলেন, তিনি আরো কিছু অধিকারও দিয়েছিলেন। এবার গান্ধীজী ভারতে এলেন। ১৯১৭তে কৃষকদের সত্যাগ্রহ হলো বিহারের চম্পারণে, তিনি নেতৃত্ব দিলেন। গান্ধী বললেন: "আমি যখন কৃষকদের দেখি মনে হয় ভগবানকে দেখছি।" তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সফল হতে হলে কৃষক এবং গরিব মানুষের অংশগ্রহণ জরুরী। ফলে, এর পরে হলো ১৯১৯-র এপ্রিল সত্যাগ্রহ এবং খিলাফত, ১৯২০তে অসহযোগ আন্দোলন। মানুষ ব্রিটিশদের ক্ষমতাকে কী চোখে দেখতেন তা বোঝাতে আকবর এলাহাবাদী একটি পদ্য লেখেন। সেখানে বলা হয়েছে, 'আমি তো মনে করেছিলাম

আল্লাহ হলেন কালেক্টর'! যেহেতু মানুষ ব্রিটিশ কালেক্টরের থেকে বেশি ক্ষমতাবান, চরম ক্ষমতার অধিকারী আর কাউকে ভাবতেই পারতেন না। কিন্তু, গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন এসব বদলে গেলো। তখন আকবর এলাহাবাদী লিখলেন:

'বুদ্ধু মিয়াঁ ভি হজরতে গান্ধীকে সাথ হ্যায়
একি মুশত-এ-খাক হ্যায় মগর আনধি কে সাথ হ্যায়'

বুদ্ধু মিয়াঁ বা সাধারণ মানুষের ভূমিকা তার আগে ভারতের ইতিহাসে কী ছিল? কিচ্ছু না! সে কোথাও ছিল না। তাকে ইতিহাসের আঙিনায় টেনে আনা হয়েছিল। যতো বেশি কৃষক, সাধারণ মহিলা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে ততই ভারত 'জাতি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কারণ, যতক্ষণ না বিপুল অংশের মানুষ মনে করছেন যে তাঁদের স্বাধীন হওয়া জরুরী এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের শাসনে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতির ধারণা তৈরি হয় না। যখন গরিব মানুষ সংগ্রামে যুক্ত হচ্ছে তাঁদের জন্য আপনার কী বক্তব্য? তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে? এখানেই আমার কাছে জওহরলাল নেহরু অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। ১৯২০সালের শেষভাগ থেকে তিনি বলতে থাকেন যে কৃষক, শ্রমিক, মহিলাদের মতো বিভিন্ন অংশের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। আমি বলছি না যে গান্ধী আর নেহেরু মিলে কেবল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল করেছেন, কিন্তু তাঁরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্র।

সাধারণ মানুষের জন্য গান্ধীজীর কী বক্তব্য ছিল? এই জটিল প্রশ্নের উত্তরে ১৯০৯সালে লেখা তাঁর বই 'হিন্দ স্বরাজ' দেখতে হবে। ১৯০৯সালের হিন্দু কাউন্সিল আইনে মুসলিমদের কিছু ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল। কংগ্রেসের অন্য নেতাদের মতো গান্ধীজী এই আইনের বিরোধিতা না করায় মুসলিমরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মুসলিম ভাইরা বাড়তি একটা সুবিধা পেলে ক্ষতি কী? তোমার ভাই কিছু পেলে তুমি খুশি হবে না? -তিনি এই প্রশ্ন তুলছেন হিন্দ স্বরাজ বইয়ে। তাঁর কাছে, ভারতের অতীত আলাদা করে হিন্দু বা মুসলিমদের নয়, দু'জনেরই। মহারাজা এবং বাদশারা পণ্ডিত এবং মৌলবীদের পরামর্শে চলে ভারতের ভালো করেছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেই সময়ে শাসন ভয়ঙ্কর ছিল, কিন্তু গান্ধীজী বলছেন ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় সেই সময় অনেক ভালো ছিল। ১৯১৫তে ভারতে আসার সময় থেকে বা তারও আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার নিন্দা করলেও জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলেননি। হিন্দ স্বরাজ-এ তাঁর বক্তব্য, এই ধরণের বিষয় যার যার ব্যক্তিগত মতের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। সরকারের তা নিয়ে কিছু বলার নেই। মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেবা করা সম্ভব। তাঁর মতে, কৃষকদের সেবা করবে জমিদাররা। কারখানায় মালিকরা শ্রমিকদের ভালোমন্দের ভার নেবে। কিন্তু বাস্তবে এই বক্তব্য যথেষ্ট ছিল না যাতে বিপুল অংশের মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান সম্ভব হয়। এখানেই বামপন্থীদের গুরুত্ব, জওহরলাল নেহরুরও। ১৯২৮থেকে তিনি কেবল ভারতের স্বাধীনতার দাবিই জানাননি। তিনি বলেছেন স্বাধীন ভারতে কৃষকদের হাতে জমি দিতে হবে, শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে, মহিলাদের পুরুষদের সমান অধিকার দিতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকের ভোটাধিকার থাকতে হবে।

কংগ্রেসের ভেতর এই দাবিগুলি নেহরু জানাতে শুরু করেন বামপন্থীদের সমর্থন নিয়ে এবং ১৯৩১সালে করাচি প্রস্তাব- যা সকলের পড়া উচিত- সেখানেই বলা হয় যে রাষ্ট্রকে ধর্মাচরণের প্রশ্নে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে, রাষ্ট্রকে মূল শিল্পগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, মহাজনদের হাতে ঋণগ্রস্ততা কমিয়ে আনতে হবে, ইত্যাদি।

আমি মনে করি, করাচি প্রস্তাবে ওঠানো এই দাবিগুলি না থাকলে ১৯৩০ এবং ১৯৪০-র দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে জনসমর্থন দেখা গিয়েছিল তা সম্ভব হতো না। আইন অমান্য আন্দোলনে কৃষকদের বিপুল সংখ্যায় জেলে যাওয়া নজিরবিহীন ছিল। তাঁদের মধ্যে বহু সম্পত্তি হারিয়েছিলেন। মনে রাখা ভালো, ব্রিটিশ জেলে যাওয়া আর আজকে জেলে যাওয়া এক নয়। সেই সময় জেলে

যাওয়ার মানে সম্পত্তি খোয়ানো, কোনোদিন চাকরি না পাওয়া, কার্যত সব খোয়ানো। তবু, ১৯৩০-র আইন অমান্য আন্দোলনে অভূতপূর্ব সংখ্যায় মানুষ জেলে গিয়েছিলেন। যাঁরা জমি, সম্পত্তি সব খুইয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই গরিব। ১৯২০তে যে অসহযোগ আন্দোলনের থেকে এই পর্ব আলাদা বিপুল গরিব মানুষের অংশগ্রহণের কারণে। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই উপাদান নতুন। আন্দোলন এমন আকার নিতেই ব্রিটিশদের পক্ষে শাসন চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়লো।

মুসলিম লিগের মুখপত্র 'ডন', ১৯৪৭ সালের আগে থেকে যা করাচি থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তাতে প্রকাশিত একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। ওই নিবন্ধে লেখক বলেছিলেন, পাকিস্তানে আমাদের সমস্যা হলো আলাদা দেশ হিসেবে পাকিস্তান গড়ার আন্দোলনে কেউ নায়ক নন, কোনো শহীদ নেই। কারণ, এই আন্দোলন কখনো ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধিতা করেনি। বিরোধিতা করেছিল সঙ্গে থাকা হিন্দুদের। আমরা কী দেখেছি? অধুনা পাকিস্তানের মাটিতে ব্রিটিশ শাসনের সময় জেলে গিয়েছিলেন খুদাই খিদমতগর-রা, পাঞ্জাবের কংগ্রেসকর্মীরা, সিন্ধের জাতীয়তাবাদীরা, এবং কখনোই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা নন। পাকিস্তান অবশ্য এই সমস্যায় একা নয়। এখন যারা আমাদের দেশ চালাচ্ছে তাদেরও এই সমস্যা রয়েছে।

হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস)-র সমস্যাও এক। আর এস এস ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কী করেছিল তাঁরা ? কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে জেলে যায়নি? এতোই যদি বিরাট দেশপ্রেমিক তাহলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনো লড়াই করলেন না কেন? একই ঘটনা হিন্দু মহাসভার ক্ষেত্রেও। সাভারকর আন্দামানে গিয়ে নিজের দেশপ্রেমিক অতীতকে পুরো মুছে ফেলে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন, বললেন ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করবেন না। তিনি আর তা করেননি, শুধু মুসলিমদের বিরোধিতা করেছেন এবং মহম্মদ আলি জিন্নারও আগে দ্বিজাতি তত্ত্বের সওয়াল করেছেন।

এখন আর এস এস অন্য বীর খুঁজছে। যেমন ভগৎ সিং। ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে আর এস এস-র কী সম্পর্ক? ফাঁসির আগে তিনি লিখেছিলেন 'কেন আমি নাস্তিক'; বলেছিলেন কংগ্রেসে যদি কোনো নেতার প্রতি তাঁর সমর্থন থাকে তাহলে তিনি জওহরলাল। যে মানুষটি বলেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা, তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘের কী সম্পর্ক? বল্লভভাই প্যাটেলও তো গান্ধীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন।

সঙ্ঘ এখন সুভাষচন্দ্র বসুর কথা বলছে। সুভাষচন্দ্র কি কখনও হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলেছেন? আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত ছিলো ইকবালের 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা'। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সরকারী ভাষা ছিলো উর্দু ও হিন্দি। বাহিনীর নাম আজাদ হিন্দ ফৌজ, সুভাষচন্দ্র বলতেন 'জয় হিন্দ'। আর এস এস জয় হিন্দ বলে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদও বলে না, যে স্লোগান ভগৎ সিং দিয়েছিলেন। ১৯৪৭-র আগে কংগ্রেসের সভায় ভগৎ সিংয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়া হতো। সুভাষচন্দ্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ জীবনীতেই আর এস এস-র সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কের কথা পাওয়া যায় না।

আর এস এস-র নায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কী ভূমিকা পালন করেছিলেন? কিছু না। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লিগের সঙ্গে যৌথ মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী ছিলেন। ব্রিটিশদের বিরদ্ধে একটি আঙুলও তোলেননি তিনি, কেবল মুসলিমদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। হিন্দুত্ববাদী শক্তির স্বাধীনতার লড়াইয়ে কোনো নায়কই নেই। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারণারই তারা বিরোধী ছিলো। হিন্দু-মুসলিম বিভাজন করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিভাজন করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, এভাবে তারা ব্রিটিশদের সাহায্যই করেছে।

এখন আমি দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি– ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য লড়াই এবং

সমৃদ্ধ ভারতের জন্য লড়াই। ১৯৪৭-র আগস্টের পরিস্থিতি আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আলিগড় ছিলো মুসলিম লিগের শক্তিশালী ঘাঁটি। চারদিকে দাঙ্গার আগুনে কে আলিগড়কে রক্ষা করবে? নেহরু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে কুমায়ুন রেজিমেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গোটা জেলাকে কে রক্ষা করবে? আজকের হরিয়ানার প্রায় সমগ্র এলাকাই জ্বলছে। তাপ্পলে মুসলিমদের গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবেশী এলাকা থেকে মুসলিমদের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে আসা হচ্ছিল। পশ্চিম উত্তর প্রদেশে শুধু গান্ধীজী মুসলিমদের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তিনি জামা মসজিদে মুসলিম শরণার্থী শিবিরে গিয়ে অপমানিত হলেন, হিন্দু শরণার্থী শিবিরে গিয়েও অপমানিত হলেন। দিনরাত তাঁকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে। পানিপথে গিয়ে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করলেন। ১৯৪৮-র ১৩ই জানুয়ারি গান্ধীজী অনশনে বসলেন। অনশনের দাবি কী ছিলো? প্রথম দাবি ছিলো মুসলিমদের রক্ষা করতে হবে। যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো করছে তাদের লিখে দিতে হবে এ কাজ তাঁরা আর করবে না। এই আলিকায় আর এস এস, হিন্দু মহাসভার লোকদের নাম ছিলো। যে মুসলিমরা পাকিস্তানে যাননি তাদের নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে দিতে হবে। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এই দাবি ছিলো বিরাট। দ্বিতীয় দাবি ছিলো পাকিস্তান সরকারকে দেয় ৫৫কোটি টাকা এখনই দিয়ে দিতে হবে কেননা পাকিস্তানের সরকারী কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না। প্রতিশ্রুত এই টাকা ভারত আটকে রেখেছিল। নিজের সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদেশের সরকারের হয়ে সওয়াল করছেন, এই প্রশ্নে গান্ধীজীর উত্তর ছিলো আমি যতটা ভারতের , ততোটাই পাকিস্তানের, আমি উভয় দেশেরই লোক।

অনশন শুরু হলে দিল্লিতে 'গান্ধী মুর্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মিছিল হয়, কোনো কোনো মিছিল তাঁর প্রার্থনা স্থলের দিকেও যায়। কিন্তু অনশনের তৃতীয় দিনে লাল কেল্লার সামনে দশ হাজার লোকের সমাবেশে নেহরু ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ শেষে জনতা তাঁর সঙ্গে সহমত হয়ে যায়। আরো দু'দিন পরে দিল্লিতে হাজার হাজার মানুষের মিছিল হয়। আলিগড়, মীরাট, মুজফফরনগর থেকে কৃষকরা আসেন, হয়তো কয়েকদিন আগেই দাঙ্গায় অংশ নেওয়া মানুষের পিতা-পিতামহরা ছিলেন। সাফাইকর্মীদের ইউনিয়ন, টাঙ্গাওয়ালা, কারখানার শ্রমিকরা ছিলেন। তারা হিন্দু মহাসভা, আর এস এস নেতাদের বাড়ি ঘিরে ধরে তাদের সই করায়, জোর করে অনেককে গান্ধীজীর অনশন স্থলে নিয়ে আসে। গান্ধীজী অনশন প্রত্যাহার করার পরে সরকার ৫৫কোটি টাকা পাকিস্তানকে দিয়ে দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দু'দেশেই হিংসা বন্ধ হয়। গান্ধীজী বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তি চিন্তাকে সরিয়ে রেখে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে লাগাতার ভূমিকা পালন করতে তিনি ছুটে বেরিয়েছেন। এ কোনো সাধারণ ব্যক্তির কথা নয়।

স্বাধীনতার পরে ১৯৫৫-৫৬তে হিন্দু দেওয়ানি বিধি চালু হয়। মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছিলো না। সেই বিধি উলটে যায়, কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত মহিলাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মশাস্ত্রের বিধান পুরো উলটে যায় এবং তা নির্বাচনে। কংগ্রেস (এবং কমিউনিস্টরা) মহিলাদের সমান অধিকারের পক্ষে সওয়াল করে নির্বাচনে লড়ে। অন্যদিকে রামরাজ্য পরিষদ, জনসঙ্ঘ ধর্মশাস্ত্রের পক্ষে সওয়াল করে। নির্বাচনে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়। দেশের ৮০শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়ানি বিধির পরিবর্তন হয়, যদিও সামাজিক প্রথার মধ্যে অসাম্য আজও রয়ে গেছে। তেমনই লক্ষ লক্ষ কৃষক জমি পান। একসময়ে কাশ্মীরের মতো উত্তর প্রদেশে জমিদারি প্রথা বিলোপের সবচেয়ে র‍্যাযডিকাল আইন ছিলো। রাজ্যগুলির নিজ নিজ আইন ছিলো। পরে ১৯৬০-র দশকে জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়। যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও, যা আজও রয়ে গেছে, নতুন ভারতের ভিত্তি রচিত হয় ১৯৫০-৬০'র দশকে।

কিন্তু দরিদ্রদের পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে? ভালো নয়। উৎসা পট্টনায়েক ' দি রিপাবলিক অফ

হাঙ্গার'–এ দেখিয়েছেন ১৯৮৯ পর্যন্ত মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ ক্রমাগতই বেড়েছে। এমনকি খরার সময়েও। ফুড কর্পোরেশনের কাঠামো, খাদ্যে ভরতুকি ইত্যাদি এর পিছনে ছিলো। কিন্তু ১৯৯১-র পর থেকে তা কমতে শুরু করে। ২০০৩-এসে তা ব্রিটিশ আমলের স্তরে পৌঁছে যায়।

আর এস এস, হিন্দু মহাসভার মুসলিম লিগের মতোই কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিলো না। তাদের কোষাগারে চাঁদা দেওয়া ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থেই তারা চলেছে। বি জে পি-র অর্থনৈতিক কর্মসূচী বৃহৎ ধনীদের স্বার্থ অভিমুখী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিদেশী পুঁজি আনার সওয়াল বা বিদেশে গিয়ে কোটি কোটি টাকা বিলোনো (যেমন মঙ্গোলিয়ায়) সবই কর্পোরেটের স্বার্থে। দরিদ্রদের জন্য কোনো কর্মসূচী তারা নিতে পারবে না। ধনীরাও বি জে পি-কে সমর্থন দিচ্ছে।

এই অর্থনৈতিক কর্মসূচী চালিয়ে যেতেই তারা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি চালিয়ে যাবে। এইভাবেই তারা কেবলমাত্র শাসন বজায় রাখতে পারে। জার্মানিতে যেভাবে নাৎসিরা জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়িয়েছিল, আর এস এস-ও সে পথেরই পথিক। সঙ্ঘের গুরু গোলওয়ালকর ইহুদী-বিরোধী নীতির জন্য হিটলারের প্রশংসা করে বলেছিলেন ভারতেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই পথই নেওয়া উচিত। মুসলিম-বিরোধী জিগির জারি রেখেই এখনও তারা এগোবে। তাদের হিন্দুত্বের ধারণার কোনো বিরোধিতাই তারা সহ্য করবে না। ইতিহাসকে তারা বিকৃত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এমনকি ছোটখাটো সাধারণ ইতিহাস বইয়েও যদি লেখা থাকে ঋগবেদ ১৫০০খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লেখা হয়েছিল তাতেও ওই বই রোষের শিকার হচ্ছে। কেননা আর এস এস তো বেদকে ৮০০০ বছর আগে নিয়ে যেতে চাইছে। পরিকল্পিত ভাবে দাভোলকার, পানেসর, কালবুর্গি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তারা বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে চায়। আই সি এইচ আর, আই সি এস এস আর, নেহরু মিউজিয়ামে কারা রইলেন তা নিয়ে কংগ্রেসের তেমন মাথাব্যথা ছিলো না, বি জে পি-র আছে। সব জায়গায় তারা সঙ্ঘের লোক বসিয়ে দখল নিতে চাইছে। ভারতীয় ইতিহাস ও সংবিধানের ভ্রান্ত চিত্র উপস্থিত করছে তারা। এই অবস্থায় বিশেষ করে শিক্ষিত ভারতীয়দের- যারা লিখে, বলে ওদের কুযুক্তির জবাব দিতে পারেন- তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমাদের ছোটখাটো ক্ষোভ-অসন্তোষ ভুলে ভারতের ধারণার বিরুদ্ধে বি জে পি-আর এস এস'র ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সময় উপস্থিত হয়েছে।

(অধ্যাপক ইরফান হাবিব ২০১৫-র ৭ই অক্টোবর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষণ দেন। সামান্য সম্পাদিত আকারে সেই ভাষণের পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হলো।)

জাত ও শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা

অমর ফারুকি

জাতিভেদপ্রথাকে ভারতীয় সমাজের প্রধান সংগঠনসূত্র বলে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। ঔপনিবেশিক যুগে এই মত বেশ জোর দিয়ে প্রচারিত হত, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দশকগুলি থেকে শুরু করে। উপরন্তু এই বিশেষত্বটি নাকি ভারতীয় সমাজকে এক আলাদা চেহারা দিয়েছে, এমনকী এক অনন্য চেহারা দিয়েছে। ভারতীয় সমাজকে বুঝতে গেলে জাতিভেদ প্রথার দিকে মনোযোগ দেওয়া যে আবশ্যিক, এ কথা অনস্বীকার্য বটে, কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে জাতিভিত্তিক পৃথকীকরণ হল শ্রেণিভিত্তিক পৃথকীকরণেরই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ। বেশ কয়েকজন গবেষক জোর দিয়েছেন জাতপাতের আচার/আনুষ্ঠানিক দিকগুলির উপর; তার ফলে জাতি ও শ্রেণির যোগসূত্রগুলি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, জাতিভেদপ্রথার শোষক প্রকৃতির উপরে নজর পড়েনি। জাতিভেদকে দেখা প্রয়োজন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতায়। খেটে খাওয়া মানুষকে দাবিয়ে রাখাই জাতিভেদের চূড়ান্ত ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ফলে প্রভুত্বকারী শ্রেণি উদ্বৃত্ত অংশটি পকেটে পুরতে পারে। কেন ভারতীয় উপমহাদেশে এই প্রথা প্রায় তিন হাজার বছর ধরে টিঁকে আছে, তার ব্যাখ্যা বহুলপরিমাণে এতেই পাওয়া যাবে (যদিও এই দীর্ঘ কালপর্বে এই প্রথার অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে)। সামাজিক নিদর্শন হিসেবে জাতিভেদপ্রথার অনেক নিজস্ব লক্ষণও আছে, সুতরাং শ্রেণিভিত্তিক অসাম্যের সঙ্গে জাতিভিত্তিক সামাজিক ধাপের তুলনা প্রতি পদে খোঁজা ভুল হবে। ভারতের সামাজিক প্রকরণের ইতিহাসকে পরিপ্রেক্ষিতে রেখে জাতের প্রশ্নটি এবং তার সঙ্গে শ্রেণির সংযোগসূত্রগুলি আলোচনা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সাজানো সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ হিসেবে চারটি বর্ণের উদ্ভব হয় আন্দাজ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, অর্থাৎ পুরাতন বৈদিক যুগের শেষ পর্বে, যখন ভারতীয় উপমহাদেশের আর্য-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শ্রেণিসমাজে উত্তরণ ঘটতে শুরু করেছিল। ২৫০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ১৯০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত বিরাজিত হরপ্পা সভ্যতারও ভিত্তি ছিল শ্রেণিবিভাজন, কিন্তু এই সভ্যতার সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না।

হরপ্পা সভ্যতার পরিসমাপ্তির (১৯০০ খ্রিঃ পূঃ-র কাছাকাছি) পরবর্তী যুগে পশ্চিম (ইরান ও আফগানিস্তান) থেকে আর্যসমাগমের জোয়ার বাড়ে; ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ-র মধ্যেই ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের আর্য বসতিতে এক নতুন ধরনের কৃষি-পশুপালন অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। 'আর্য' বলতে বোঝায় একটি ভাষাগোষ্ঠী; অর্থাৎ সেই সব জনগোষ্ঠী

যারা ইনডো-এরিয়ান ভাষাগুলির (যেগুলি সুবৃহৎ ইনডো-ইয়োরোপিয় ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত) একটিতে কথা বলত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য সমাগমের প্রথম পর্যায়ে ('পুরাতন বৈদিক যুগ') আর্যরা কী ধরণের সামাজিক প্রকরণ তৈরি করেছিল, তার সাবুদ পাওয়া যায় প্রত্নতত্ত্বে তো বটেই, ঋগ্‌বেদেও (১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিঃ পূঃ-র কাছাকাছি রচিত)। সে সমাজ ছিল পুরোপুরি গ্রামীণ; পশুপালন ছিল, তার সঙ্গে কিছুটা কৃষিও ছিল। আর্যরা ঘোড়া নিয়ে এসেছিল সঙ্গে; ঘোড়ার কোনও উল্লেখ পাই না প্রাগ্‌বৈদিক যুগে। বলদে টানা রথ ছিল হরপ্পার যুগে, তার বদলে এল ঘোড়ায় টানা রথ; ফলে নিশ্চয় সহজ হয়েছিল নানা আর্য বা অনার্য গোষ্ঠীকে দমন করা। ঋগ্‌বেদে বারবার উল্লেখ আছে সেই সব সংঘর্ষের, যেখানে একদিকে আছে আর্য উপজাতিগুলি, আর অন্যদিকে 'দস্যু' এবং 'দাস'। দাসরা (এমনকী দস্যুরাও) হয়তো বা আর্য ছিল (অর্থাৎ কোনও একটা ইনডো-এরিয়ান ভাষায় কথা বলত); হয়তো তারা আরও পুরোনো কোনও কোনও বিদেশাগত জনতরঙ্গের প্রতিনিধি। দাসেদের প্রতি কম আক্রমণাত্মক মনোভাব (দস্যু সাবাড়ের প্রচুর উল্লেখ আছে, দাসেদের বেলায় তা নয়) দেখে মনে হয়, দাসেরা সম্ভবত ভাষাগতভাবে বৈদিক-সংস্কৃতভাষী আর্যদের নিকটতর ছিল।

পুরাতন বৈদিক যুগের শেষ দিকে পরাভূত দস্যু ও দাসদের একত্রে 'শূদ্র' নামক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে মনে হয়। যদিও শূদ্র কথাটি ঋগ্‌বেদে একবার মাত্র দেখা দেয়, তবু সেখানকার প্রসঙ্গটি থেকে এবং পরবর্তী যুগের প্রমাণ থেকে ইঙ্গিত মেলে যে পুরাতন বৈদিক যুগের অবসানের আগেই খুব ক্ষীণ আকারে দেখা দিচ্ছিল বর্ণভেদের উচ্চ-নিম্ন বিন্যাস। সকলেরই জানা আছে ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে চর্তুবর্ণের উল্লেখ আছে : ব্রাহ্মণ, রাজন্য (এর পরিবর্তে ক্ষত্রিয় কথাটি পরে ব্যবহৃত হয়), বৈশ্য এবং শূদ্র। এটি ঋক্ বেদের সবচেয়ে পরে রচিত অংশ, হয়তো পুরাতন বৈদিক যুগ শেষ হবার পরেও রচিত হয়ে থাকতে পারে। কেবল নিজ বর্ণের মধ্যেই বিবাহ করা তখনও প্রচলিত হয়নি।

শূদ্ররা, যাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ক্রীতদাস ছিল (লক্ষ্য করবেন, ক্রীতদাস অর্থে ব্যবহৃত 'দাস' শব্দটি এসেছে পরাভূত দাস উপজাতির নাম থেকে), বৈদিক সংস্কৃতভাষী আর্যদের তুলনায় অধম বলে গণ্য হত। তাদের কোনও অধিকার ছিল না, তারা কেবল শ্রমের জোগান দিত। প্রথম দিকের রচনায় ক্রীতদাসত্বের কথায় উল্লেখ থাকত ক্রীতদাসীর; যুদ্ধবিগ্রহে পরাজিতপক্ষের পুরুষরা নিহত হতো, নারীরা হতো দাসীত্বে বদ্ধ। শ্রেণিবৈষম্যের পাশাপাশি চলত লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য। আর্যজাতিগুলির অভ্যন্তরেও বৈষম্য বাড়তে লাগল, তখন আর্যদেরও একটা অংশ শূদ্রত্বে নেমে গেল; বৈদিক বসতির প্রসারের ফলে বৈদিক সমাজের সংস্পর্শে এল যে সব উপজাতি তাদেরও হল শূদ্রত্বে অধোগতি।

এর পরের পর্যায়ে, অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে (আনুমানিক ১০০০ – ৭০০ খ্রিঃ পূঃ), এই সব প্রবণতা আরও প্রাধান্য পেল। এই যুগে বৈদিক বসতির এলাকা পূর্বদিকে সরে গেল, গাঙ্গেয় অঞ্চলের দিকে। এই অত্যুর্বর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে গেলে ঘন জঙ্গল কেটে সাফ করতে হয়, আর তার জন্য প্রয়োজন লৌহধাতুবিদ্যা (১০০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে শুরু)। তবে লোহার ব্যবহার খুব ছড়িয়ে পড়ল পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষ দিকে। পূর্বদিকে যাত্রার সঙ্গে যোগ হল প্রযুক্তিতে উন্নতি; উভয়ে মিলে এমন একটা বস্তুগত পরিস্থিতি তৈরি করল যেখানে এক বিশাল উদ্বৃত্তের উৎপত্তি সম্ভব। এর ফলে শ্রেণিবৈষম্য দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠে। এর প্রতিফলন দেখা যায় বর্ণভেদব্যবস্থার অনমনীয় উচ্চ-নিম্ন প্রভেদে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা নিজেদের বৈশ্য-শূদ্র থেকে আলাদা করে দেখতে লাগল, দাবি করতে লাগল সংরক্ষিত পদমর্যাদা। পৃথকীকরণের বৃদ্ধি শূদ্রকে সেবক শ্রেণিতে পরিণত করল; ক্রমেই তাদের আর সম্পত্তিতে দখল রইল না। বৈশ্যদের আচারের মাধ্যমে শূদ্রদের থেকে আলাদা করা হল; তাদের

দেওয়া হল উপনয়নের অধিকার এবং তার ফলে দ্বিজত্বে অন্তর্ভুক্তি। শূদ্রকে পরিত্যাগ করার ওপর এইভাবে প্রতীকী জোর দেওয়া হল।

ইতিহাসের এই ধারা বেদোত্তর যুগেও চলল : শূদ্রের (এবং কিছু পরিমাণে বৈশ্যেরও) সামাজিক অবস্থানের অবনমন হতে লাগল ক্রমাগত। বেদোত্তর যুগে অনমনীয়ভাবে স্তরবদ্ধ শ্রেণিসমাজ দেখা দিল, যার ভিত্তি শূদ্র, বৈশ্য এবং 'জাতিচ্যুত' গোষ্ঠীগুলির শ্রমের উপর। বর্ণভেদের উচ্চ-নিম্ন ব্যবস্থার ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উচ্চারিত হল এই যুগে। ভাষায় রূপ দিয়ে নিম্নবর্ণগুলির উপর অত্যাচারকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা হল। ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ২০০ খ্রিঃ পূঃ-র মধ্যে রচিত আপস্তম্ব, বৌধায়ন, গৌতম ও বশিষ্টের প্রথম দিকের ধর্মসূত্রগুলি জাতিভেদপ্রথাকে স্থায়িত্ব দিল, তার দৃঢ় আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করল।

সাধারণত শূদ্রদের সম্পত্তি থাকত না, তারা ক্ষেতমজুর (কর্মকার/ কম্মকার অর্থাৎ মজুরি শ্রমিক) হিসাবে অথবা কারিগর হিসাবে কাজ করত। একাংশ ছিল ক্রীতদাস, যদিও কৃষি-উৎপাদনে ক্রীতদাসের শ্রমের প্রসার খুব বেশি ছিল না। ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে শূদ্রদের জড়ানো হল আচারগত অপবিত্রতার সঙ্গে (অর্থাৎ এই ধারণার সঙ্গে যে তাদের উপস্থিতি অপবিত্র বা দূষণকারী)। সাথে সাথে একটি পৃথক জনসমাজ নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হচ্ছিল; তারা শূদ্রের চেয়েও বেশি লাঞ্ছিত, বর্ণভেদ ব্যবস্থারও বাইরে, তাদের ছোঁয়া যাবে না, তারা অস্পৃশ্য (যেমন চণ্ডাল)। বঞ্চনার আরও নানা ধরণের প্রক্রিয়া ছিল তাদের জন্য।

অস্পৃশ্যরা আলাদা একটি বর্ণ কি না, তা নিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে কিছুটা দ্ব্যর্থকতা আছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্ণসংক্রান্ত ধ্রুপদী মতবাদে চারটি মাত্র বর্ণ আছে। গোড়ার দিকে অস্পৃশ্যরা পৃথক ছিল 'অস্পৃশ্যতায়' নয়, তাদের বাসস্থান ছিল আর্যবসতির সীমান্তে (অন্ত, অন্ত্যজ, প্রত্যন্ত প্রভৃতি কথায় বোঝা যাচ্ছে এইসব জনগোষ্ঠীর স্থান বা অবস্থান ছিল এক প্রান্তে)। উল্লিখিত জনগোষ্ঠীগুলি ছিল 'অন্তর্ভুক্ত অপর'। চণ্ডাল ছাড়াও অস্পৃশ্য হিসাবে নিষাদের উল্লেখ প্রায়ই আছে প্রাচীন লেখায়। সাধারণভাবে সব অন্ত্যজ গোষ্ঠীগুলিকে বোঝাতে 'অস্পৃশ্য' শব্দের ব্যবহার সবে শুরু হয় খ্রিষ্টিয় তৃতীয় শতক নাগাদ, কিন্তু এর আগেই চণ্ডালের উল্লেখ আছে পরবর্তী বৈদিক যুগে রচিত যজুর্বেদে; সেখানে তাদের অনুষঙ্গ শ্মশান।

শূদ্ররা (শ্রমের মাধ্যমে, কখনও বা দাসশ্রমের মাধ্যমে) এবং বৈশ্যরা (করের মাধ্যমে) যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত, তাকে শোষণ করেই প্রধানত গড়ে উঠেছিল উচ্চবর্ণগুলির ঐশ্বর্যের ভিত্তি, আ. ৬০০ খ্রিঃ পূঃ-র আগেই। এই পর্যায়ে কৃষক সমাজের বেশির ভাগই ছিল বৈশ্য (বাণিজ্য এই বর্ণের প্রাথমিক পেশা ছিল না)। তা ছাড়া এই যুগে বাণিজ্যের তো খুব একটা সুদূরপ্রসারী হবার কথা নয়। এই উৎপাদনকে 'শূদ্র-বৈশ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া' নাম দিলেই উপযুক্ত হবে। এই প্রক্রিয়া চলেছিল প্রায় প্রাচীন যুগের সমাপ্তি ও আদি-মধ্য যুগের আরম্ভ পর্যন্ত (৭৫০ খ্রিঃ নাগাদ)।

'শূদ্র-বৈশ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার' সাফল্য দেখা যায় মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানে (৩০০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ); এই সাম্রাজ্যের বৈভবের উৎস হল উৎপাদনের এই ধরণ। শূদ্র ও বৈশ্যদের নিকট হতে শোষিত উদ্বৃত্ত পরিকল্পিতভাবে আত্মসাৎ করেই সম্ভব হয়েছিল মৌর্য যুগের শক্তিশালী রাষ্ট্রের উৎপত্তি, তার সুবৃহৎ আমলাতন্ত্র, এই উপমহাদেশে তখনও পর্যন্ত অভূতপূর্ব পরিমাণে রাজ্যবিস্তার, বিশাল স্থায়ী সৈন্যদল, কৃষির বিস্তার, বাণিজ্যের বিকাশ ইত্যাদি। মৌর্য যুগের ইতিহাসের একটি প্রধান আকর হল অর্থশাস্ত্র। এই গ্রন্থ পড়লে বোঝা যায়, 'শূদ্র-বৈশ্য উৎপাদনপ্রক্রিয়ার' প্রসারণে ও তাকে শক্তিশালী করায় বড় ভূমিকা ছিল মৌর্য রাষ্ট্রের। এই উদ্দেশ্যে কৃষি-উৎপাদনে সরাসরি অংশ নিয়েছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রায়ত্ত জমিতে রাষ্ট্র-মালিকানার ক্রীতদাসেরা (প্রধানত শূদ্র) চাষ করত। অবশ্য অস্থাবর ক্রীতদাসপ্রথার প্রসার খুব একটা হয়নি। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে ৫০০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং

আরও যে সব ধর্মীয় পরম্পরার উদ্ভব হয়, তারা ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেনজ্ তৈরি করেছিল বটে, কিন্তু বর্ণভেদপ্রথার ভাবাদর্শকে বা অনুষ্ঠানকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি।

মনুস্মৃতি-র প্রধান অংশ ২০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত, যদিও তাতে আগেকার অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে মনুস্মৃতি সম্পূর্ণ হয় বলে ধরা হয়। বর্ণভেদপ্রথাকে স্পষ্ট রূপ দেবার প্রয়াস আছে এই গ্রন্থে, নিম্ন জাতিগুলির উপর কঠোর বাধা ও নিষেধ চাপানো আছে। কঠোরতম নিষেধগুলি ছিল অস্পৃশ্য-সম্পর্কিত। উল্লেখ করা উচিত যে এর আগেই অর্থশাস্ত্র তীক্ষ্ম সীমারেখা টেনেছিল চণ্ডাল ও অন্যান্য জাতির মধ্যে। কোনও কোনও মার্কসবাদী গবেষক মনে করেছেন, মনুস্মৃতিতে জাতিসংক্রান্ত নিষ্ঠুর নির্দেশ সমাজের একটি সংকটের প্রতিফলন, যেখানে নিম্নজাতির মানুষ তাদের জীবিকার বিরুদ্ধে ব্রহ্মণ্যবাদের বিধিনিষেধ মানতে চাইছিল না। মনুস্মৃতি বর্ণসংকর নামক ধারণাকে তুলে ধরল। বহুসংখ্যক জাতির অস্তিত্বের পিছনে একটা যুক্তি খাড়া করার জন্য একটা মতাদর্শ গড়ার খাতিরে এই নতুন ধারণার প্রয়োজন হল। বেশ কয়েকটি নতুন জাতির উদ্‌ভবের ব্যাখ্যা হিসেবেও এর প্রয়োজন ছিল। অবাঞ্ছিত সহবাসের মাধ্যমে জাতিমিশ্রণ বোঝাতে বর্ণসংকর কথাটি ব্যবহৃত হত। উচ্চবর্ণের নারী ও নিম্নবর্ণের পুরুষের যৌন মিলনের (প্রতিলোম) ফলে জাত সন্তানকে বর্ণ-সিঁড়ির সবচেয়ে নিচের ধাপে স্থান দেওয়া হত। কারণ, প্রতিলোম মিলন বর্ণসংক্রান্ত নিয়মের থেকে সবচেয়ে গুরুতর বিচ্যুতি বলে গণ্য হত। উদাহরণস্বরূপ, চণ্ডালকে মনে করা হত ব্রাহ্মণ নারী ও শূদ্র পুরুষের যৌন মিলনের ফলে জাত সন্তান। যে সব উপজাতিকে ব্রহ্মণ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হত, তাদের সামাজিক অবস্থান ঠিক করতেও কাজে লাগত এই ধরনের ব্যাখ্যা। এই সব উপজাতি সম্প্রদায়কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শূদ্র হিসাবে গণ্য করা হয় বা অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করা হয়; এখন তারা কোনও না কোনও জাতের রূপ নিয়েছে বিবর্তিত হয়ে। দেখা যায়, এই যুগের জাতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ততদিনে জাতই হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতিভেদপ্রথার একক। সর্বভারতীয় স্তরে প্রথাটিকে বোধগম্য রাখার জন্য বর্ণ-ধারণার প্রয়োজন ছিল। বর্ণ-কাঠামোর মধ্যে জাতকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল উচ্চ-নিম্ন জাতিসোপানের কোন ধাপে কে দাঁড়িয়ে সেটা ঠিক করার জন্য।

গুপ্ত যুগের শেষ দিকে (অর্থাৎ খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শতক ও তার পরে) তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল। এর মধ্যে দুটি বড় ঘটনাক্রম : নগরকেন্দ্রগুলির ও বাণিজ্যের ক্ষয়: এবং অর্থাভাব। এরই সম্পৃক্ত ঘটনা রাষ্ট্র কর্তৃক জমি-দানের সংখ্যাবৃদ্ধি, যা গুপ্তযুগে লক্ষনীয় হয়ে ওঠে এবং গুপ্ত-পরবর্তী যুগে দেশকে ছেয়ে ফেলে। যারা জমি পেল, তারা উচ্চাধিকারসম্পন্ন একটি শ্রেণি হিসাবে আবির্ভূত হল। এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে গুপ্ত যুগ শেষ হবার আগেই শূদ্ররা দাসত্বাবস্থা কাটিয়ে উঠছিল (অনেক সময়ে শূদ্র প্রতিরোধের জন্য) এবং তারা ও বৈশ্যরা গ্রামাঞ্চলের চাষী-প্রজা নামক বিপুল শ্রেণির অংশ হয়ে গিয়েছিল। আরও উঁচু শ্রেণিভুক্ত ভূস্বামীরা উদ্বৃত্ত আদায় করত; ধর্মীয় আচারেও তাদের স্থান ছিল উঁচুতে।

গুপ্তোত্তর যুগে সমাজের যে আকার দেখা যায়, তাকে কোনও কোনও মার্কসবাদী গবেষক 'সামন্তবাদী' বলেছেন; এই ব্যবস্থা চালু ছিল প্রায় ছয় শতাব্দী জুড়ে, উত্তর ভারত থেকে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশেও বিস্তারলাভ করে। দক্ষিণ ভারতে সামন্তবাদের বিকাশে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল ব্রাহ্মণদের প্রতি ভূমিদানের (ব্রহ্মদেয়), বিশেষত চোল আমলে (দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

দিল্লির সুলতানী আমলে (১২০০ থেকে ১৫২৬) নিম্নজাতির এবং জাতিচ্যুত মানুষের সামাজিক অবস্থানের লক্ষণীয় কোনও পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয় না, বরং মুসলমান সমাজও জাতিপ্রথার

কিছু কিছু দিক লালন করে। নতুন নতুন কারুশিল্প দেখা দেওয়ার ফলে অনেকগুলি নতুন জাতির উদ্ভব হল এই যুগে। অসিনির্মাতা ও গালিচানির্মাতার মত কারিগর-গোষ্ঠী ক্রমশ রূপান্তরিত হল নিম্নজাতিতে। লক্ষণীয় যে সুলতানি আমলে অভিজাত তুর্কি শাসককুলের কোনও প্রবক্তা জাতিভেদের সমালোচনা করেননি। তাছাড়া তুর্কি শাসকগোষ্ঠীরা অভিজাতরা বেশির ভাগই ছিল নগরভিত্তিক; কৃষি-উৎপাদনে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না তাদের। গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত সংগ্রহের চালু ব্যবস্থাটা অবিকল রাখাই তাদের পছন্দ ছিল।

মোগলরা এল; ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই দেখা দিল একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র (অবশ্য প্রাগাধুনিক রাষ্ট্র, কাজেই তার কেন্দ্রীভবন তখনকার বস্তুগত পরিস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ)। উদ্বৃত্ত আদায়কে এই রাষ্ট্র বিধিবদ্ধ আকার দিল, বিশেষ করে মূল এলাকাগুলিতে। রাজস্ব সংগ্রহের একটি সুসংবদ্ধ এবং কর্মক্ষম সংগঠন গড়ে তুলেই তা সম্পন্ন করা হলো। নিজেদের কর্তৃত্ব জারি রাখতে ও সাম্রাজ্যবিস্তার করতে যে বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন, এর ফলে মোগলরা তাও গড়তে পারল। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, উৎপাদনের এশিয় পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসের যে ধারণা, মোগল সমাজ ব্যবস্থা ছিল তারই কাছাকাছি, কারণ উদ্বৃত্তের প্রায় সবটাই রাষ্ট্র আত্মসাৎ করত, উৎপাদিত উদ্বৃত্তের প্রায় কিছুই গ্রামে পড়ে থাকত না। প্রাণধারণের জন্য ন্যূনতম যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুই থাকত কৃষকের জন্য, কিংবা তার থেকেও কম। মোট ছবি যা বেরিয়ে আসে, তা হলো সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে কৃষকসমাজের দৃঢ়তর শোষণ, এমন এক সময়ে যখন কোনও তাৎপর্যপূর্ণ প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটছে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির অন্তর্নিহিত কারণ হলো এটাই। কৃষি সঙ্কটের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষক প্রতিরোধ দেখা দেয়।

মোগল রাষ্ট্রও গ্রামীণ সমাজে জাতপাতের উঁচু-নিচু কাঠামোয় বিশেষ হাত দেয়নি; ফলে জাতিগত অসাম্য চিরস্থায়ী রইল। কৃষি অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত-শোষণের কলকাঠির পক্ষে জাতিবৈষম্য ছিল অত্যাবশ্যক। নিম্নজাতির মানুষ, বিশেষ করে দলিতরা, ছিল ভূমিহীন/অনুগত মজুরদের এক বিশাল উৎস। উচ্চবর্ণের মানুষকে গ্রামীণ সমাজে বিশেষ অধিকার দিয়ে মোগল রাষ্ট্র এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো যে সমাজ গঠনে জাতিভিত্তিক শোষণ যেন একটি প্রধান সূত্র হিসাবে থেকেই যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঘটল উপনিবেশবাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি; তাতে কিন্তু জাতিভেদপ্রথা দুর্বল হলো না। বরং আরও সবল হলো, এমন কতকগুলি উপকরণ আয়ত্ত করল যা স্বাধীনতার পরেও রয়ে গেছে। যে সব গবেষকরা ঔপনিবেশিক যুগে জাতিভেদ প্রথার সমীক্ষা করেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে ঔপনিবেশিক শাসন গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জাতিভেদকে এমনভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছে যা প্রাক্-উপনিবেশিক যুগে সম্ভব ছিল না। জাতিবৈষম্যকে শক্তিশালী করেছে ঔপনিবেশিক ভূমিরাজস্ব নীতি ও আইন ব্যবস্থা। উপরন্তু, ভারত সাম্রাজ্যকে ফলপ্রসূভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়েছিল ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপাদনের ও সেই জ্ঞানকে সুবিন্যস্ত করা। বোঝা গিয়েছিল যে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছাড়া যথাযথ ভারত শাসন সম্ভব নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে আরম্ভ করে তার পরেও চেষ্টা চলেছিল সেইসব গ্রন্থকে চিহ্নিত করার যেগুলি ভারতের অতীত, তার প্রথা, তার ধর্মীয় ঐতিহ্যসমূহ, তার আইনবিন্যাস প্রভৃতি বুঝবার জন্য প্রয়োজন। এই অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উইলিয়ম জোন্‌স প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদের এবং এশিয়াটিক সোসাইটি (প্রতিষ্ঠা ১৭৮৪) ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮০০)-এর মত প্রতিষ্ঠানের। ধর্মগ্রন্থ ও আইনগ্রন্থ খুঁজে বার করে অনুবাদ করানো হল 'নেটিভ' বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। উচ্চবর্ণ থেকেই এই বিশেষজ্ঞদের সংগ্রহ করার প্রবণতা ছিল। ফলে সমাজ সম্পর্কে যে বোধ দেখা দিল, তার উপর ব্রহ্মণ্যবাদী বিশ্ববীক্ষার ছাপ স্পষ্ট। ভারতীয় সমাজের কেন্দ্রীয়

গঠনসূত্র হিসাবে যে জাতিভেদকে দেখা হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! একদম গোড়ার দিকে যেসব বই অনুদিত হল, তার মধ্যে ছিল মনুস্মৃতি। এই গ্রন্থ ও তার মতো গ্রন্থকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র উচ্চমর্যাদা দিয়েছিল। জাতিভেদ সম্পর্কে ব্রহ্মণ্যবাদী আদর্শকে জোরদার করার সহায়তা হলো এতে। এইসব গ্রন্থের উল্লেখ করে জাতিবৈষম্যের পক্ষে সওয়াল করা যেত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আরও কিছু ঘটনাক্রমের ফলে জাতিভেদ প্রথা আরও অনমনীয় হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে ছিল জনগণনার তথ্যসংগ্রহ ও সেগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা এবং ঔপনিবেশিক নৃকুলবিদ্যাচর্চা। জনগণনা ও ঔপনিবেশিক নৃকুলবিদ্যা উভয়েই জোর দিল জাতের উপর। বিশেষ করে জনগণনা গোটা জনসংখ্যাকে জাতপাত অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করে (এর মধ্যে মুসলমানদেরও ধরা হয়, যেমন ১৮৯১ জনগণনায়) জাতিভেদের গণ্ডি এমন দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেবার চেষ্টা করল যে জাতিগত অবস্থান অনড় হয়ে গেল। তার মানে দাঁড়াল এই জাতিসোপানের নিচের ধাপগুলিতে যারা আছে তারা নিচের ধাপেই রয়ে যাবে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আচারবিচার, সবদিক থেকেই। শেষ পর্যন্ত, ওই শতক শেষ হবার আগেই, ঔপনিবেশিক নৃকুলবিদরা জাতি (race) ও জাত (caste)-এর সংযোগ ঘটাল। উঁচু জাতের লোকেরা নাকি উন্নত জাতির প্রতিনিধি। 'জাতি' কথাটাই মতবাদের সৃষ্টি, কিন্তু জাতির মতো জাতকেও তখন থেকে প্রকৃতির অংশ বলে গণ্য করা হতে লাগল। জাতকে যেন মানবসমাজ বানায় নি, তা যেন প্রকৃতিরই সৃষ্টি। এই ধারণার বশবর্তী যারা, তাদের মতে জাতপাতের উঁচু-নিচু প্রতি পদে জাতিগত উঁচু-নিচুর অনুরূপ। ঔপনিবেশিক মতবাদের প্রবক্তারা যুক্তি দিলেন, উঁচু জাতের লোকেরা নিজের জাতে বিয়ে করার নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলে, তাই তারা তাদের জাতিগত শুদ্ধতা বজায় রাখতে পেরেছে। নিচু জাতির লোকেরা নিম্নমানের কারণ তারা জাতিগত মিশ্রণে জাত।

এই ধারণার অগ্রগণ্য প্রবক্তা ছিলেন এইচ এইচ রিসলি নামক প্রভাবশালী ঔপনিবেশিক প্রশাসক। ১৯০১ সালের জনগণনায় তালিকাভুক্ত জাতিগুলিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ধর্মাচার অনুযায়ী সজিয়ে মর্যাদা-তালিকায় স্থান দেওয়ার যে চেষ্টা হয়, তার দায়িত্বও রিসলির। এইভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক জাতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অর্থ দাঁড়াল জাতপাতের ভেদাভেদকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া। একইসঙ্গে এর ফল দাঁড়ালো জাতপাতের পরিচিতি অনুযায়ী রাজনৈতিক জমায়েত; আবার অন্যদিকে উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দলিত ও নিম্নবর্ণের আন্দোলন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই ধরণের রাজনৈতিক জমায়েত। জাতপাতের মতো শক্তিশালী যন্ত্রের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করার দীর্ঘ ইতিহাসকে বিবেচনার মধ্যে আনা কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের কর্তব্য; তেমনই আবার ঔপনিবেশিক শাসনকালে জাতপাত যে বিশেষ রূপ পেল তাও বিবেচনায় আনতে হবে, তা না হলে সমকালীন ভারতে এই সমস্যাটির মোকাবিলা করতে পারব না।

এখনকার ভারতে, আজও, জাতিভেদপ্রথা হলো শ্রমজীবী জনগণের উপর অত্যাচার চালানোর এক শক্তিশালী যন্ত্র। যুগপৎ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, কৃষিমজুরের মধ্যে, কৃষকের মধ্যে, মধ্যবিত্তের মধ্যে এবং গরিবের মধ্যে বিভেদ আনার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। জাতপাতভিত্তিক সংহতি শ্রেণিসংগ্রামকে নস্যাৎ করার কাজে লাগে। কিন্তু সমস্যাটিকে জটিল করে তুলেছে নিম্নজাতির উপর, বিশেষত দলিতের উপর, অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস। জাতিসংক্রান্ত সংস্কার এত গভীরে প্রোথিত যে ভারতের ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামকে মেলাতে হবে জাতিভেদের ভিত্তিতে গঠিত সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এর সঙ্গে। মানুষের অধিকারের আন্দোলনের বিষয়সূচিতে এর জায়গা করে দিতে হবে। কৃষিসম্পদে,

বিশেষত জমিতে, দলিত মানুষের দখল কম; এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় আরও বেশি করে তারা গিয়ে পড়েছে প্রান্তিকতায়/অবহেলায়। তারাই ভূমিহীনদের মধ্যে একটা বড় অংশ। অনেকে বাধ্য হয় শহরাঞ্চলে চলে যেতে; সেখানে আবার বিশাল পরিমাণ মজুত শ্রমের একটা বড় অনুপাত দলিত মানুষেরই, বেশির ভাগই অসংগঠিত, দরাদরির কোনও ক্ষমতা নেই, অতএব শোষণের মুখে একেবারে প্রতিরক্ষাহীন। শ্রেণিগত বঞ্চনার ঘনিষ্ট যোগ রয়েছে তাদের জাতিগত অবস্থানের সঙ্গে। দলিত অবস্থান কিন্তু কেবল দারিদ্র্যের প্রশ্ন তুলছে না। সামাজিক প্রতিবন্ধক, এবং দলিত হওয়ার ফলে প্রাত্যহিক অপমান, তাদের ওপর অত্যাচারকে একটা চরম আকার দিয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে, কী গ্রামে কী শহরে, দলিতের উপর নৃশংসতা একটি নিয়মিত ঘটনা। সাম্যের অধিকার যাতে অর্থবহ হয়ে ওঠে তার জন্য ভারতের সংবিধানে প্রজ্ঞাজাত ব্যবস্থা আছে, তফসিলভুক্ত জাতিগুলির জন্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ। কিন্তু আজও, সংরক্ষণের পর কয়েক দশক কেটে যাওয়ার পরেও আমলাতন্ত্রের বা শিক্ষায়তনের উচ্চতম পদগুলিতে দলিতরা দুর্লভ। বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা তো আরও খারাপ। নিরপেক্ষ দর্শকদের সাধারণ প্রতীতী হলো, অধিকাংশ দলিতের জন্য সংরক্ষণ কোনও সমতা আনতে পারেনি।

অন্যান্য নিম্নজাতি আছে, যাদের অনেকেই মোটামুটি পড়ে সরকার-নির্ধারিত 'অন্যান্য নিম্নবর্গ' (OBC) নামক অংশের মধ্যে। তাদেরও বঞ্চনার মূলে আছে অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস। তাদের ক্ষেত্রেও জাতিগত পরিচিতি শ্রেণিগত অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উৎপাদনের উপকরণের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ তাদের নেই, থাকলেও খুব সীমিত নিয়ন্ত্রণ। তাদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বহুতর উপায়ে অন্যে আত্মসাৎ করে। উপরন্তু, যে বৈষম্যের জন্য দলিতরা ভোগে, সেই বৈষম্য এদের ক্ষেত্রেও আছে; ততটা কঠোর না হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। OBC-দের সম্পর্কে জাতিগত সংস্কার যে কত সুগভীর, তা প্রকাশ্যে চলে এসেছিল যখন (OBC-র জন্য সংরক্ষণ বিষয়ে) মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হবার বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী ও উচ্চবর্ণ দলবলের ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ দেখা দেয়।

OBC-র কোনও কোনও অংশের জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক সমাবেশের (যাকে আজকাল তাচ্ছিল্য ভরে 'জাতিবাদ' বলা হয়) স্থান আসলে আধুনিক ভারতের এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পরম্পরার মধ্যে, যার মাধ্যমে দলিত ও অন্যান্য নিম্নবর্ণ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করত উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে। ওই ধরণের সমাবেশের কতকগুলি গুরুতর সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ, শ্রেণিভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গঠনে এগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আরও মৌল সমস্যা আছে একটি। যে পার্টিগুলি বা সংগঠনসমূহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর পক্ষাবলম্বনের দাবি করে, তাদের রাজনীতি বুর্জোয়া রাজনীতির কাঠামোর মধ্যেই থেকে যায়। ফলে শ্রেণিশোষণের প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করার সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়।

শোষিত মানুষের মধ্যে জাতপাতের পরিচিতিবোধ যত দৃঢ় হয়েছে, তত তার বিরূপ অভিঘাত পড়েছে বামপন্থীদের উপর, বিশেষত উত্তর ভারতে। ফলে নির্বাচনের রাজনীতিতে বামপন্থীরা সেখানে খুব দুর্বল হয়ে গেছে। শ্রেণিভিত্তিক সৌভ্রাত্র গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে (এই ঘটনা পুরোপুরি যে সাম্প্রতিক, তা বলা যাবে না)। সমাজের দুর্বলতর অংশগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সেই প্রবাহকে আরও দ্রুত করছে শক্তিশালী জাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব; যেমন 'খাপ' পঞ্চায়েত (প্রধানত হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে)। এরা সুপ্রাচীন বলে দাবি করছে, কিন্তু আসলে এদের উদ্ভাবন বেশ সাম্প্রতিক; অনেক ক্ষেত্রে বোধহয় উনিশ শতকের শেষ বছর পঁচিশ বা বিশ শতকের গোড়ার দিক। অবশ্য এরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছরে। স্ত্রী-পুরুষ অসাম্যকে জোরদার করেছে 'খাপ' পঞ্চায়েতগুলি। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণেও তাদের ব্যবহার করা

হয়েছে; উদাহরণ, মুজফ্‌ফরনগরের দাঙ্গা। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের মাধ্যমে জাতিভিত্তিক জনসমাবেশকে দৃঢ় করার একটি ধাঁচ তৈরি করছে দেশের অন্যান্য স্থানের জন্য; সেখানে তাদের পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে শ্রেণিশোষণকে তীব্রতর ও বামপন্থাকে দুর্বল করার জন্য।

আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জাতপাতের বিষয় বিবেচনার মধ্যে আনতে গেলে কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। জাতিগত অত্যাচারের নৃশংসতম রূপগুলিকে বিশেষত দলিতদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুলে ধরতে হবে প্রচার আন্দোলনের মধ্যে। খুব সজাগ থাকতে হবে সংরক্ষণ সম্পর্কিত সাংবিধানিক নিয়ম বিকৃত করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে। সবচেয়ে নিঃস্ব যারা তাদের সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করাই এই ধরনের বিকৃতির লক্ষ্য (যেমন 'প্যাটেল' সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে গুজরাটের বর্তমান আন্দোলন)। শোষিতদের আন্দোলনকে ভেঙে টুকরো করার সম্ভাবনা কিন্তু জাতিভিত্তিক জনসমাবেশের মধ্যে আছে। সেইজন্য কেবল জাতপাতের ওপরেই নজর যাতে না পড়ে, সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক থেকেছি।

অন্যদিকে, পার্টি জাতপাতের প্রশ্নকে উপেক্ষা করেনি। কোনও কোনও দলিত কর্মী বা প্রবক্তা অন্যায় সমালোচনা করে বলেছেন যে ভারতের কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জাতপাতকে গুরুত্ব দেয়নি। এ কথা সত্য নয়। আসলে দলিত এবং OBC -র রাজনৈতিক সংগঠনগুলিই শ্রেণিগত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে চায়নি। তারা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাঠামোর মধ্যেই থেকে গেছে। অনেকগুলি কারণের মধ্যে এই কারণটির জন্যও তারা দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির রাজনীতির সঙ্গে তাদের নিজেদের রাজনীতির কোনও বিরোধ অস্বীকার করেছে, এবং তার ফলে থেকে থেকেই বি জে পি-র সঙ্গে হাত মেলানোর সুবিধা হয়েছে। অন্যদিকে তারা বামপন্থীদের সঙ্গে দৃশ্যগোচর ব্যবধান রেখে গেছে, দু-চারবার ছাড়া। যারা OBC-দের হয়ে কথা বলছে বলে দাবি করে, এমন অনেক রাজনৈতিক সংগঠনের ওই একই অবস্থা। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার, তারা শুধু শ্রেণির প্রশ্ন এড়িয়ে চলে না, তাদের বিশ্ববীক্ষা পিতৃতান্ত্রিক এবং তার ফলে নারীর সমতাবিধানের আন্দোলনকেও তারা বাধা দিচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী শক্তি এবং OBC-র হয়ে কথা বলার দাবিদার রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জোটবদ্ধ হয়ে বাধা দিচ্ছে বলেই সংসদে এবং বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের আসন-সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন দীর্ঘকাল ঝুলে আছে।

ভারতে জাতপাতের এত গুরুত্ব যে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অন্যান্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যদি হাতে হাত মিলিয়ে না চলে, তা হলে সমতার জন্য লড়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কমরেড ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের ভাষায় : "বুঝতে হবে যে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ধাঁচে ভারতকে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন হল জাতিভিত্তিক হিন্দু সমাজ ও তার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র গড়ারও কোনও প্রশ্ন নেই, যতক্ষণ না ভেঙে ফেলছি ভারতের 'সুপ্রাচীন' সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই দুর্গকে, অর্থাৎ উঁচুজাত-নিচুজাতের সোপানের ধাপে ধাপে বিভক্ত সমাজকে। সোজা কথায়, মৌলিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইকে জাতিবিভক্ত সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পৃথক করা যাবে না।"

একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজি: মার্কস থেকে পিকেটি

এম এম আকাশ

'What these gentlemen all lack is dialectic. They never see anything but here cause and there effect. That is a hollow abstraction, that such polar opposites only exist in the real world during crises, while the whole vast process proceeds in the form of interaction (though of very unequal forces, the economic movement being by for the strongest most elemental and most decisive) and that here everything is relative and nothing is absolute-this they never begin to see. Hegel has never existed for them." [Source: Marx-Engels (1975a)]

'এসব ভদ্রলোকের মধ্যে যা নেই তা হলো দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো কিছুর কারণকে এক স্থানে আর ফলাফলকে অন্য স্থানে দেখতে তারা বেশ অভ্যস্ত–এ ছাড়া অন্য কিছুই তারা দেখতে পায় না। ফলে এটি হয়ে দাঁড়ায় অন্তঃসারশূন্য বিমূর্তায়ন। বাস্তব দুনিয়ায় কেবল সংকটকালীন মুহূর্তেই এমন সংলগ্ন জিনিসের এ ধরনের বিপরীত মেরুর অবস্থান দেখা যায়। অথচ ইতিহাসজুড়ে কারণ ও ফলাফলের বিশাল প্রক্রিয়াটি বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়নি, বরং আমরা এদের দেখি দ্বান্দ্বিক রূপে (যদিও তা সংঘটিত হয় খুবই অসম দুই শক্তির মধ্যে: অর্থনৈতিক গতিশীলতার শক্তিই এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী নির্ধারক হিসেবে কাজ করে)। এ কারণে দুনিয়াতে সবকিছুই আপেক্ষিক; কোনো কিছুই শাশ্বত নয়–যা তারা এখনো বুঝতে শুরু করেনি। হেগেলকে তারা কখনোই বুঝে উঠতে পারেনি।' [উপরিউক্ত ইংরেজি উদ্বৃতির লেখককৃত বঙ্গানুবাদ]

প্রারম্ভিক কথা

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হচ্ছে মার্কসের সব লেখার প্রাণবস্তু। একে অনুধাবন না করে মার্কস অধ্যায়নের প্রচেষ্টা দুই ধরনের একদেশদর্শিতার (One-sidedness) জন্ম দিয়েছে। এক দল মার্কসের আবিষ্কৃত স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষ আপেক্ষিক শিক্ষাগুলোকে একধরনের আপ্ত বাক্যে পরিণত করে মার্কসকে ধর্মগুরুর মতো মর্যাদা দান করেছে। আরেক দল মার্কসবিরোধী পণ্ডিত 'খড়ের মার্কস' তৈরি করে তাকে খণ্ডন করে ভেবেছে যে অবশেষে মার্কস খণ্ডিত হলো! মার্কসকে দেবতা বানানোও যেমন ভুল, তেমনি মার্কসকে সাবজেকটিভ পাঠের মাধ্যমে একটি 'খড়ের মার্কস' তৈরি করাও কোনো একাডেমিক সততার পরিচয় বহন করে না। যেকোনো মহৎ লেখকের লেখা থেকে একটি বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াই তাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দেওয়া খুবই সহজ একটি কাজ। মার্কস বহুবার এ ধরনের

আক্রমণের শিকার হয়েছেন। দুটি সুপ্রচলিত উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন বলা হয় মার্কস 'সমাজতন্ত্রের' কথা বলেছেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে অতএব মার্কস ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। আবার উলটো বলা হয় 'সমাজতন্ত্রের' অভ্যন্তরীণ কোনো ত্রুটি ছিল না, মার্কসের তত্ত্ব থেকে বিচ্যুতি ও বাইরের ষড়যন্ত্রই সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ। এই দুই রকম তত্ত্বই ভুলে যায় যে মার্কস বা এঙ্গেলস কেউই সমাজতন্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট দিয়ে যাননি এবং আমাদেরই দেশের একজন প্রগতিশীল অধ্যাপক খুব সুন্দর করে বলেছেন যে 'পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের রচনা ভাণ্ডারটিকে যদি আমরা সাগর নাম দিই, তাহলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার রচনাবলির নাম হওয়া উচিত গোষ্পদ'। তাই সমাজতন্ত্রের পরবর্তী ব্যর্থতা বা ত্রুটির সবকিছুর জন্য মার্কসকে অনর্থক দায়ী করা যেমন ভুল তেমনই স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে মার্কসকে হুবহু প্রয়োগ করার চেষ্টা করাটাও ভুল।

মার্কসের জন্ম ১৮১৮ সালের ৫ই মে। লেনিন তাঁর কার্ল মার্কস প্রবন্ধে লিখেছেন, '১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ আরামকেদারায় বসে শান্তভাবে মার্কস তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন' [লেনিন, ১৯১৪]। এই শান্তভাবে মৃত্যুবরণকারী মানুষটির জীবন ছিল বেশ অশান্ত। তিনি ছিলেন দেশান্তরি বিপ্লবী। পুলিশ তাঁকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। প্রথমে বেলজিয়াম, তারপর ফ্রান্স, তারপর জার্মানিতে আবার সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে ফ্রান্সে এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত লন্ডনে এসে মার্কস স্থিতিশীল হন এবং সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। মার্কসের ৬৫ বছরের এই জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে পুঁজি (Capital) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচনা ও প্রকাশ। জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পায় ১৮৬৭ সালে। পরবর্তী সময়ে ১৮৭৩ সালে এর দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণটি প্রকাশিত হয় এবং সেটিরও ভূমিকা লেখেন কার্ল মার্কস। তৃতীয় এবং চতুর্থ জার্মান সংস্করণটি প্রকাশিত হয় মার্কসের মৃত্যুর পর ১৮৮৩ এবং ১৮৯০ সালে। উভয়ের ভূমিকা লিখেছেন মার্কসের আজীবন বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। আমরা যে ইংরেজি অনুবাদে ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড পড়ে থাকি সেটিও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মার্কসের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ সালে এবং সেটারও ভূমিকা লিখেছিলেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তিনিই মার্কসের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে ক্যাপিটাল-এর অন্য দুটি খণ্ড সম্পাদনা করেছেন।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের বিষয় হচ্ছে পুঁজি এবং পটভূমি হচ্ছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ইউরোপ, আরও ঠিক করে বললে ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ড। এ যুগটা ছিল পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশের যুগ। মার্কসের ভাষায় যার 'ক্লাসিক গ্রাউন্ড' (চিরায়ত ভিত্তি) হচ্ছে ইংল্যান্ড। মার্কস নিজেই পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভূমিকাতে লিখেছেন:

'In the work I have to examine the capitalist mode of production and the conditions of production and exchange corresponding to that made up to the present time, their classic ground is England. That is the reason why England is used as the chief illustration in the development of my theoretical ideas.' (এ লেখায় আমাকে পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি এবং তার উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্তাবলিকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত এর চিরায়াত ভিত্তিভূমি হচ্ছে ইংল্যান্ড। সে জন্যই আমার তাত্ত্বিক ধারণাসমূহের বিকাশের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ইংল্যান্ডকেই প্রধান দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।)

তারপরেই তিনি তার জার্মান পাঠকদের সতর্ক করে বলেছেন যে ইংল্যান্ডের শিল্প ও কৃষি শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে জার্মানরা যদি মনে করে থাকেন যে জার্মানিতে অবস্থাটা মোটেও তত খারাপ নয়, তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। কারণ, তাঁর ভাষায়, 'The country that is more developed industrially only shows to the less developed the image of its future.' (উন্নত শিল্পায়িত

দেশটি হচ্ছে কম উন্নত দেশটির ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি মাত্র।)

এ উদ্ধৃতি থেকে মনে হতে পারে যে মার্কস সব দেশের জন্য পুঁজিবাদী বিকাশের এবং তার যন্ত্রণাময় পরিণতির (শ্রমিক শ্রেণির জন্য) অবধারিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এবং সে জন্য হয়তো পুঁজিপতিদেরই তিনি জঘন্য শত্রু হিসেবে দায়ী করেছেন। অনেক মার্কসবাদী এভাবেই মার্কসকে পাঠ করেছেন। তার ফলে পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবিতা ও পুঁজিপতিদের নেতিবাচক অনির্বার্যতাই তাদের পাঠে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

এ ধরনের ভাবাদর্শভিত্তিক পাঠের অসুবিধা হলো : এটি মার্কসের সামগ্রিক পাঠ নয়। দ্বান্দ্বিক পাঠও এটি নয়। মার্কসেরও একটি ভাবাদর্শ আছে কিন্তু সেটিও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে নির্মিত। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে পুঁজি সব সময় 'একরকম ভালো' বা 'একরকম খারাপ' থাকেনি। আমাদের 'পুঁজিকে' দেখতে হবে তার জন্ম-বিকাশ-মৃত্যু – এই দীর্ঘ গতিশীল পথ পরিক্রমণের ধারায় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। কখন পুঁজি দুর্বল হচ্ছে, কখন সে সবল হচ্ছে, বিকাশমান পুঁজি নিজেই কখন স্থবির ও সংকটে পতিত হচ্ছে, কখন সে সংকটে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে মৃত্যু আসন্ন কিন্তু তারপরও কখনো সে 'ফিনিক্স পাখির' মতো ছাইভস্ম থেকে পুনরায় উদিত হচ্ছে, আবার আরেকটি বৃহত্তর সংকটের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য সেই বিচিত্র গতি-পরিণতির সব মাত্রা ও দিকের আন্তক্রিয়ায় পুঁজিকে আমাদের দেখতে হবে একটি জীবন্ত গতিশীল সত্তা রূপে, যদি আমরা প্রকৃতই মার্কসের মতো করে পুঁজিকে দেখতে চাই। মার্কসের মতো করে পুঁজিকে দেখার অর্থ কী তা মার্কসের মুখেই শোনা যাক। 'পুঁজি' গ্রন্থের জন্য রচিত এই প্রথম খণ্ডের প্রথম ভূমিকাতেই মার্কস পরিষ্কার করে বলেছেন :

'It is the ultimate aim of this work, to lay bare the economic law of motion of modern society-it can neither clear by bold leaps, nor remove by legal enactments, the obstacles offered by the successive phases of its normal development. But it can shorten and lessen the birth pangs. To prevent possible misunderstanding a world. I paint the capitalist and the landlord in no sense couleur de rose. But here individuals are dealt with only in so far as they are the personifications of economic categories, embodiments of particular class relations and class interests. My standpoint from which the evolution of the economic formation of the society is viewed as a process of natural history, can less than any other make the individual responsible for relations whose creature he especially remains, however much he may subjectively raise himself above them.

'এই গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, আধুনিক সমাজের (পুঁজিবাদের – কারণ সেটাই তখন ছিল বিশ্বের আধুনিক সমাজ-লেখক) গতির অর্থনৈতিক বিষয়টি উন্মোচিত করে প্রদর্শন করা। এর স্বাভাবিক বিকাশের নিয়মানুযায়ী যেসব প্রতিবন্ধকতা পর্যায়ক্রমে এর সামনে উপস্থিত হবে, যেগুলো সে দুঃসাহসী লম্ফ দিয়েও পার হতে পারবে না। আইনকানুন প্রণয়ন করেও দূর করতে পারবে না তবে যেসবের ভূমিষ্ঠ হওয়ার যন্ত্রণাকে সে কিছুটা কমাতে বা হ্রাস করতে পারবে। ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যাতে না থাকে সে জন্য আরেকটি কথা। আমি পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের যে ছবি এখানে এঁকেছি তা কোনো অর্থেই সোনালি বর্ণের হয়নি। কিন্তু এখানে ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থনৈতিক প্রত্যয়, বিশেষ শ্রেণি সম্পর্ক এবং বিশেষ শ্রেণি স্বার্থের প্রতীক রূপে। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের বিবর্তন হচ্ছে একটি স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, এই ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তি হচ্ছে এসব সম্পর্কেরই সৃষ্টি।

এসব সম্পর্কের পরিবর্তনের জন্য একক ব্যক্তিকে তাই দায়ী করা আমার পক্ষে একেবারেই

অসম্ভব তা সে ব্যক্তি বিষয়ীগতভাবে নিজেকে যত উপরেই তুলে ধরুন না কেন।'

ঊনবিংশ শতকে পুঁজির বিকাশের নিয়মাবলি – মার্কসের দৃষ্টিতে

পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পুঁজির গতিচিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস যে বিষয়ানুক্রম অনুসরণ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত ক্রম প্রথমে তুলে ধরছি :

ক. পুঁজির প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পণ্যের বিনিময়-প্রক্রিয়ায় মুদ্রার অনিবার্য উদ্ভবের নিয়ম।

খ. দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মুদ্রার পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ার নিয়ম। কীভাবে সরল পণ্য উৎপাদন জটিল পণ্য উৎপাদনে পরিণত হচ্ছে ইত্যাদি।

গ. তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির নিয়ম।

ঘ. চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পুঁজিপতি কর্তৃক উন্নততর প্রযুক্তিগত বিকাশের প্রক্রিয়াটি।

ঙ. এসবের ধারাবাহিক পরিণতিতেই পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে প্রথমে হস্তশিল্প গিল্ড। তারপর একই ছাদের তলে বৃহদায়তন হস্তশিল্প, যাকে মার্কস ম্যানুফেকচারিং নাম দিচ্ছেন। সর্বশেষে জন্ম নিচ্ছে বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ শ্রম বিভাজনসহ বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প। একই দেশের ভেতরে এরপর থেকে কৃষি এবং শিল্প, শহর এবং গ্রাম সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। সামন্তবাদ তখন আর প্রধান উৎপাদনপদ্ধতি নয়।

মার্কসের এসব বিশ্লেষণ থেকে পুঁজির যৌক্তিক বিবর্তনশীল মডেলটি আমাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এই মডেলে পুঁজির পরিপূর্ণ বিকশিত পর্যায়ক্রমিক রূপগুলো হলো : মুদ্রারূপ পণ্যরূপ উৎপাদনশীলরূপ আবার নতুন পণ্যরূপ আবার মুদ্রারূপ। এভাবেই পুঁজি ক্রমাগত রূপান্তরিত এবং আবর্তিত হচ্ছে। নিচের নকশায় মার্কসের এই ক্রমাগত বিকাশমান পুঁজির পর্যায়ক্রমিক রূপগুলোর চিত্রটি তুলে ধরা হলো :

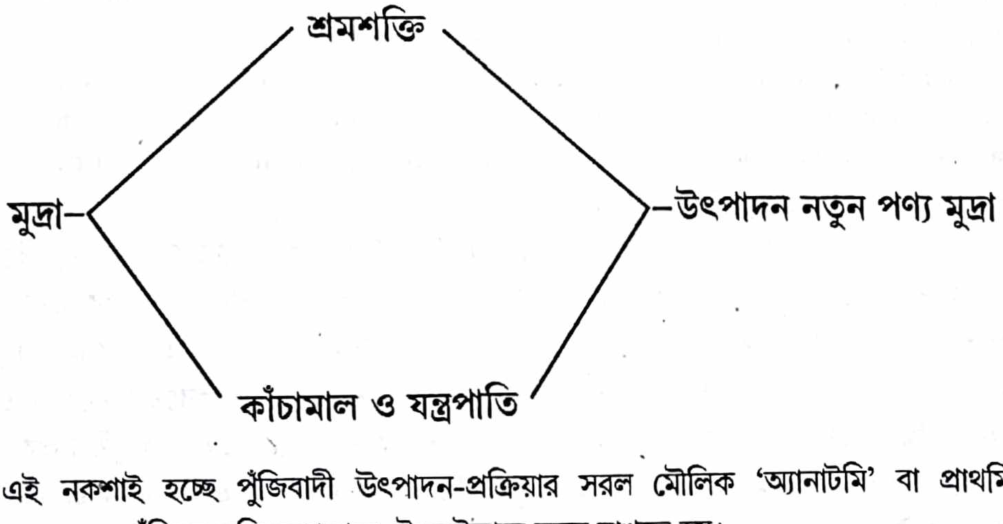

এই নকশাই হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সরল মৌলিক 'অ্যানাটমি' বা প্রাথমিক অঙ্গব্যবচ্ছেদ। পুঁজিকে যদি মসৃণভাবে টেকসইভাবে সচল রাখতে হয়।

তাহলে তাকে তার সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচল রাখতে হবে এবং পুঁজির প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক রূপের মধ্য দিয়ে পুঁজিকে আবর্তিত হতে হবে। নিজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাত্রা করে আবার বর্ধিত আয়তনে যাত্রাবিন্দুতে উপনীত হতে হবে নতুন যাত্রা শুরুর জন্য। যতক্ষণ পুঁজি এই প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারবে ততক্ষণ পুঁজির কোনো সংকট নেই– বিনাশ নেই। এই কাজে

পুঁজির প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে ক্রমাগত মুনাফা আহরণ বা উদ্বৃত্ত আহরণ ও তার ক্রমাগত উৎপাদনশীল পুনর্বিনিয়োগ। প্রবৃদ্ধির এই জান্তব অভীপ্সাই হচ্ছে পুঁজিবাদের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি।

উৎপাদনশক্তির বিকাশের এই দিকটাকেই মার্কস মধ্যযুগের অচলায়তন ভাঙার অগ্রদূত হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু এটুকু সত্য আবিষ্কার করে বা উন্মোচিত করেই মার্কস ক্ষান্ত হননি। পুঁজির যেমন জন্মকালীন প্রগতিশীলতা আছে, তেমনি তার বার্ধক্য এবং মুমূর্ষুতাও থাকবে – গতিশীল দ্বান্দ্বিক দার্শনিক মার্কসের কাছে সেটা স্বতঃসিদ্ধ একটি বিষয়। কিন্তু মাকৎস ইউটোপিয়ান বা কাল্পনিক দার্শনিক ছিলেন না। তাই তিনি চেষ্টা করেছেন পুঁজির বাস্তব অর্থনৈতিক আত্মগতির মধ্যেই পুঁজির আত্মবিধ্বংসী উপাদানগুলো খুঁজে বার করতে। আজকের যুগে আমরা যখন পুঁজি নিয়ে আলোচনা করব তখন এই দ্বিতীয় দিকটিও আমাদের ভালোমতো নজর দিতে হবে।

পুঁজির আত্মবিধ্বংসী যে উপাদানগুলো মার্কস তদানীন্তন পুঁজিবাদের গতিকে বিশ্লেষণ করে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেগুলোই এখানে তুলে ধরছি :

১. অবাধ বাজারব্যবস্থায় বৃহৎ পুঁজি ছোট পুঁজিকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবে, যেহেতু স্কেল অব ইকোনমি বিদ্যমান।

২. ক্ষুদ্রায়তন ব্যক্তিমালিকানা তাই বাজার প্রতিযোগিতার অধীনে ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে যাবে, টেকসই হবে না।

৩. সমাজে দুই মেরুর সৃষ্টি হবে – একদিকে সম্পদ এবং আয়ের প্রাচুর্য এসে জমা হবে। অন্যদিকে স্বল্প আয় ও সম্পদহীনতা বৃদ্ধি পাবে।

৪. বিশাল শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব হবে। তারাই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণিতে পরিণত হবে। এবং শ্রেণি সংগ্রাম ত্বরান্বিত হবে।

৫. বাজারে অপরিকল্পিত উৎপাদনের কারণে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সর্বদা দামের ওঠানামা চলতে থাকবে। মন্দা ও স্ফীতির ব্যবসা চক্র থেকে পুঁজিবাদের মুক্তি কখনো হবে না।

৬. কখনো অতি-উৎপাদন ও মন্দা, কখনো স্বল্প উৎপাদন ও মুদ্রাস্ফীতি চলবে।

৭. যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ও মহিলা শ্রমিকেরা প্রতিকূল শর্তে শ্রমবাহিনীতে যোগ দেবেন। যন্ত্র কর্তৃক শ্রম প্রতিস্থাপিত হবে বেকারত্বও সৃষ্টি হবে।

৮. পুঁজিবাদ মজুরিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বদাই একটি রিজার্ভ আর্মি অব লেবার বেকারত্বেও টিকিয়ে রাখবে, তাই সেখানে কখনো ফুল এমপ্লয়মেন্ট বেকার জনগোষ্ঠী তৈরি হবে না।

৯. পুঁজির প্রাচুর্য হলে পরে মুনাফার হার ক্রম অবনতিশীল হবে। ফলে পুঁজির বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির গতি আবার শ্লথ হয়ে যাবে। অথবা সেই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য ঔপনিবেশিক অভিযান ও যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটবে।

১০. উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হবে সামাজিক সহযোগিতা। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিষম বণ্টনব্যবস্থার কারণে সমাজে শ্রেণিভেদ ও শ্রেণিবৈষম্য বাড়তে থাকবে। ফলে একসময় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অধীনে আর উৎপাদন শক্তিগুলো ভারসাম্যপূর্ণ সহযোগিতামূলক বিকাশ সম্ভব হবে না। পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছেদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করবে। পুঁজিবাদের পতন ঘটবে। উচ্ছেদকরীরা উচ্ছেদ হয়ে যাবেন।

একবিংশ শতকের পুঁজির বিশ্লেষণ করতে হলে আজ আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে মার্কসের বিশ্লেষিত উপরিউক্ত নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে কোনগুলো এখনো যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রামাণ্য সত্য হিসেবে বিরাজমান। আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এখানে 'অল অর নান' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সঠিক হবে না। কারণ এ কথা যেমন সত্য যে পুঁজিবাদ কখনোই সংকটশূন্য হতে পারেনি, তেমনি

আবার এ কথাও সত্য যে পুঁজিবাদ কখনোই সংকট সমাধানের জন্য নিজস্ব স্বার্থে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা থামায়নি। মার্কস বর্ণিত নেতিবাচক দিকগুলো পুঁজিবাদের ভেতরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বদাই কম-বেশি ঐতিহাসিকভাবে উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত হয়েছিল কিন্তু নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সংস্কারমূলক হস্তক্ষেপের ফলে তা সর্বত্র সোজা সংকটের বা বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যায়নি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে আলাদা ধরনের অভিঘাত এবং ফলাফলের জন্ম দিয়েছে। একবিংশ শতকে যদি মার্কস আবার ফিরে এসে দ্বিতীয়বার পুঁজি গ্রন্থটি লিখতেন তাহলে পুঁজিবাদের অভিযোজন ক্ষমতা নিয়ে তাঁর একটি দীর্ঘ নতুন মূল্যায়ন করতে হতো বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে মালিকানার ব্যক্তিগত রূপের যে মৌলিক দ্বন্দ্বটি পুঁজিবাদকে কখনো ছাড়েনি, শোষণ ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিষয়টিও যে পুঁজিবাদের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য সে সত্যগুলো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তবে আপেক্ষিকভাবে সামন্তবাদের বা খুদে উৎপাদনব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদের যে অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে এবং কোথাও কোথাও সমাজতন্ত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রীয় পলিসির মাধ্যমে নিজস্ব নেতিবাচক দিকগুলোকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ যে যথেষ্ট সংকুচিত করতেও সক্ষম হয়েছে তা আমাদের নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা এটাও জানি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের বিশেষ ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশের অধীনেই একই সঙ্গে প্রবৃদ্ধি ও বৈষম্য হ্রাস সম্ভব হয়েছিল। একবিংশ শতকে এসে এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলো থেকে মার্কসবাদীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকু না নিলে আমরা এমন 'মার্কসবাদী'তে পরিণত হবো, যাদের সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে মার্কসকে বলতে হয়েছিল 'All I know that I am not a Marxist' (মার্কস-এঙ্গেলস, ১৯৭৫বি)। একবিংশ শতকে এসে পুঁজিবাদের মধ্যেও আজ কতকগুলো নতুন উপাদানের আবির্ভাব হয়েছে, যেগুলো চিরায়ত মার্কসবাদে ধরা পড়া সম্ভব ছিল না। কারণ পুঁজিবাদের অভিযোজনের ইতিহাস তখনো ততটুকু মাত্রায় বিকশিত হয়নি, যা থেকে মার্কস নতুন তথ্য ও নতুন বিশ্লেষণ সম্পন্ন করতে পারতেন। তখনো কেনস আসেনি এবং কল্যাণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরও আবির্ভাব হয়নি। সে জন্যই আজ পুঁজি গ্রন্থে উনবিংশ শতকে পুঁজির যে অঙ্গব্যবচ্ছেদ মার্কস করেছিলেন এবং 'অনিবার্য সংকট' সম্পর্কে যে শর্তসাপেক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেখানে শর্তাবলির মধ্যে কোনো লক্ষণীয় বিশেষ পরিবর্তন এসেছে কিনা, সেটাও আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদেরাই কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তনের মধ্যে বারবার তারা প্রধানত চারটি পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন।

চারটি নতুন উপাদান

প্রথমত, মার্কসের বর্ণিত পুঁজির বিভিন্ন রূপ এখন পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার আকৃতি ধারণ করেছে। যদিও তারা আসলে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আর্থিক পুঁজি, শিল্প পুঁজি, বাণিজ্যিক পুঁজি, কর্পোরেট পুঁজি, বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনে কোনোটিই উৎপাদনশীল খাতের সঙ্গে যোগাযোগ এখন অনেক বেশি দূরবর্তী ও অপ্রত্যক্ষ। যেমন ব্যাঙ্কিং পুঁজি বা ফিনান্স পুঁজি এখন নিজেই নিজের এক বিশাল বৈশ্বিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। পণ্যের বাজার শুধু নয়, পুঁজি ও মুদ্রার বাজারও এখন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ফলে পুঁজির গতিশীলতাও যেমন বেড়েছে, সংকটও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালের সংকট ও ১৯৯৫ সালের এশিয়ান সংকট তারই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত, এখন একবিংশ শতকে নতুন তথ্য-গবেষণা ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অভূতপূর্ব বিকাশ সাধিত

হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, অন্যদিকে আবার 'জ্ঞান' নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ফলে শুধু যন্ত্রের বা শ্রমশক্তির নিয়ন্ত্রণ নয়, জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণও শাসকশ্রেণির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। উলটোদিক দিকে জ্ঞানী শ্রমজীবীদের উৎপাদনশীলতা এবং দর-কষকষির ক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জ্ঞানকে জ্ঞানের মালিক ব্যক্তি থেকে আলাদা করে ক্রয়-বিক্রয় করা যাচ্ছে না। এর ফলে পুঁজি এখন একটি অসমসত্ত্ব শ্রমবাহিনী তৈরি করেছে, যেখানে নানা ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শ্রমিক তৈরি হয়েছে। কেউ পাচ্ছেন বেতন, কেউ পাচ্ছেন মজুরি। এমনকি কেউ কেউ পাচ্ছেন মুনাফার অংশ। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেলেও, উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের কারোরই কোনো মালিকানা, কর্তৃত্ব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। আবার কোথাও কোথাও শ্রমজীবীরা সোস্যাল সলিডারিটি সেক্টরের অধীনে যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে শ্রমিকশ্রেণির ভেতরেই আয় ও সম্পদের যথেষ্ট তারতম্য তৈরি হয়েছে। মার্কস যেমন ভেবেছিলেন বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অধীনে দুনিয়ার সব শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হবে, তেমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা অটুট ঐক্য আগের মতো সহজে আর তৈরি হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, পুঁজির আবর্তন চক্র এখন আরও বেশি করে জাতীয় পরিসীমা অতিক্রম করে বৈশ্বিক শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু এই পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রম বিভাজন আঞ্চলিকভাবে বৈষম্যপূর্ণ এক শ্রম বিভাজন, কারণ এখানে পুঁজির গতিতে অধিকার অসীম অথচ শ্রমের গতির অধিকার বেশ সীমিত। ফলে পুঁজি অনায়াসে সস্তা শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য নিজের বাসা থেকে দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে ছুটে যেতে পারছে। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত শ্রম বিভিন্ন অঞ্চলে বন্দি এবং পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হতে না পেরে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করছে। আর যদিও কখনোবা সুযোগ পেয়ে পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তা হচ্ছে খুবই প্রতিকূল প্রতিযোগিতার শর্তে। অন্যদিকে, আগে থেকে প্রান্তের রাজ্যগুলোতে অবস্থিত জাতীয় শিল্প পুঁজির সঙ্গে বাইরে থেকে নতুন ছুটে আসা পুঁজির দ্বন্দ্বও কোথাও কোথাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্মুক্ত পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থায় তাই আঞ্চলিক বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, একটি অসম বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া চলছে: একদিকে কোথাও কোথাও আঞ্চলিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ শ্রেণি বৈষম্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে আবার এরই পাশাপাশি শ্রমজীবী অধঃস্তন অ-মালিক শ্রেণির সদস্যদের মধ্যে তাদের শাসক কর্তৃক নানা ধরনের সংস্কারের প্রকোপ এবং সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিপ্লবী পরিবর্তন না করেও বিশ্ব শ্রমজীবীদের একটি বড় অংশ বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের প্রাক্ পুঁজিবাদী ও অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর জনগণ বৈশ্বিক পুঁজিবাদের ভেতরে থেকেই আপওয়ার্ড মোবিলিটির কোনো না কোনো স্পেস খুঁজে বের করে নিচ্ছেন। হতে পারে সেটা বিদেশি পুঁজির ও প্রযুক্তির আগমন। হতে পারে সেটা প্রবাসে গমন। হতে পারে সেটা একটা শ্রমঘন রপ্তানি শিল্পের অভ্যুদয়। কোথাও কোথাও নিচ থেকে উঠে তৈরি হচ্ছে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অর্থাৎ পুঁজিবাদ মানেই স্থবিরতা-সংকট – এরূপ সরল চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। তবে এসব সুযোগ-সুবিধা-সংস্কারের স্কোপ স্থান-কাল-পাত্রভেদে একেক অঞ্চলে একেক মাত্রায় বিদ্যমান। এই কারণে এই বৈশ্বিক বিকাশ সুষম নয়।

মার্কসবাদীদের আত্মজিজ্ঞাসা

মার্কসবাদীরা আজ এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। একবিংশ শতকে তাদের সামনে পুঁজিবাদের সংকট নিয়ে যত না প্রশ্ন, তার চেয়ে অনেক বড় প্রশ্ন সমাজতন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ে। তাদের মধ্যে যারা

হতাশ তাদের বক্তব্য হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের তো সমাজতন্ত্র বিলুপ্তই হয়ে গেল। তাহলে কি এখন বলতে হবে সমাজতন্ত্র পরাজিত হয়েছে? পুঁজিবাদই কি ইতিহাসের শেষ কথা? এদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতে ও বলতে শুরু করেছেন 'সমগ্র জীবনটা কি আমরা বৃথাই সমাজতন্ত্রের পেছেন ছুটলাম?'

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবদানের সময় শুধু বর্তমান মুহূর্তের পরিস্থিতি বা ব্যক্তিগত জীবনের হতাশার বা বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা দ্বারা পরিচালিত হলে সেটা হবে কমিউনিস্টদের জন্য খুবই দুঃখজনক। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এটুকু ইতিহাসচেতনা অবশ্যই রাখতে হবে যে 'সমাজতন্ত্রের' পরাজয় মানেই পুঁজিবাদের বিজয় নয়। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপে সমাজতন্ত্রের যে বিপর্যয়, সেখানেই ইতিহাস থেমে নেই। আবার পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই বিশ্ব ইতিহাসের শেষ কথা হতে পারে না।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আশু 'দীপ্তি' দেখে কমিউনিস্টদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যে কোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী শোষিত জনগণ যতদিন আছেন ততদিন তাদের উদ্বৃত্ত মূল্য চুরির ব্যাপারটি থাকবে। হতে পারে কোথাও তা নগ্নভাবে উচ্চহারে করা হয়, কোথাও তা রেখেঢেকে নিম্নহারে করা হয়। কিন্তু কমবেশির প্রশ্ন নয়, যতদিন শোষণ ও অন্যায় থাকবে ততদিন তার বিরুদ্ধে শোষিতদের ন্যায়ের সংগ্রাম চলতে থাকবে। ততদিন কমিউনিজমের ও কমিউনিস্টদের ইচ্ছানিরপেক্ষ সামাজিক বাস্তব ভিত্তি থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে – এটা কঠিন সংগ্রামে সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে শামিল হবে, নাকি একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকেই জীবনের মূল্য লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে শ্রমজীবী শোষিতরাই এই কঠিন পথের প্রধান যাত্রী হবেন। কমিউনিস্টদের তাই স্বাভাবিক সমর্থন ভিত্তি হবে 'শ্রমজীবী শোষিত জনগণ'। অন্য শ্রেণির লোক, যে পরিমাণ যৌথ স্বার্থের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন, সে পরিমাণে তাঁরা হলেন কমিউনিস্টদের সহযাত্রী, মিত্র বা সহানুভূতিশীল সমর্থক। সব বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের আজ ঠিক করতে হবে, তারা কি তাদের পুরানো ঐতিহাসিক প্রকল্পের ভুল-ভ্রান্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, শৌর্য-বীর্য, হাসি-কান্নায় ভরপুর অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করবেন এবং পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, নাকি পুরানো ঐতিহ্যকে ধারণ করেই তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাবেন। বিজ্ঞানের জগতে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন যেমন নিউটনীয় পদার্থবিদ্যাকে ধারণ করেই তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ইতিহাস প্রমাণ করে যে বর্তমান যুগের নতুন সত্য অতীতের পুরানো সত্যকে কখনোই পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেয় না। এ প্রসঙ্গে অ্যান্টি-ডুরিং গ্রন্থে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের প্রদত্ত একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি। এঙ্গেলস লিখেছেন,

'বয়েলের সুপরিচিত সূত্রটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক। এই সূত্র অনুযায়ী তাপের পরিমাণ যদি সমান থাকে তাহলে একটি গ্যাসের পরিমাণ তার চাপের পরিমাণের ভিত্তিতে বিপরীতক্রমে পরিবর্তন হবে। রেনলট, দেখলেন, এই সূত্রটি কয়েকটি ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। রেনলট যদি আমাদের দার্শনিকের মতো বাস্তবতার দার্শনিক হতেন তাহলে তাঁকে বলতে হতো : বয়েলের সূত্র পরিবর্তনীয় এবং সূত্রটি সত্য নয়। সূত্রটি মিথ্যা। কিন্তু তেমন সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি বয়েলের সূত্রে যতটা 'অসত্য' আছে তার চেয়ে অনেক বড় এক অসত্যে পতিত হতেন। তাঁর নিজের সত্য বিন্দুটি মিথ্যার বালুকা-স্তূপে তলিয়ে যেত। তাহলে তাঁর মূল সঠিক সিদ্ধান্তটিকে তিনি এমন ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করতেন, যার তুলনাতে বয়েলের সূত্রে যে বিন্দু পরিমাণ অসত্য রয়েছে সেই অসত্যসহ বয়েলের সূত্রটি সত্য বলে বোধ হতো। কিন্তু রেনলট তা করেননি। কারণ তিনি একজন বিজ্ঞানী। তাই তিনি এসব শিশুসুলভ কাজে ব্যস্ত না থেকে তাঁর গবেষণা নিয়ে অগ্রসর হন এবং পরিশেষে এই সত্য আবিষ্কার করেন যে

বয়েলের সূত্র মোটামুটি সঠিক। কিন্তু যে গ্যাসকে চাপের মাধ্যমে তরল করা যায় (অর্থাৎ চাপের যে বিন্দুতে গ্যাস তরল হতে শুরু করে) সে ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রযোজ্য থাকে না। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বয়েলের সূত্রের সঠিকতা প্রমাণিত হলো। কিন্তু সেই সীমার মধ্যে সূত্রটিকে কি চরম এবং অন্তিমভাবে সত্য বলা চলে? কোনো পদার্থবিজ্ঞানীই এমন কথা বলবেন না। তাঁর কথা হবে, চাপ এবং তাপের কিছু সীমার মধ্যে এবং কতিপয় গ্যাসের ক্ষেত্রে সূত্রটি ঠিক। এবং এভাবে অধিকতর নির্দিষ্ট সীমার ক্ষেত্রেও তিনি ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তিতে এর অধিকতর সীমাবদ্ধতা এবং নতুনতর সূত্র তৈরির সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেবেন না।' (দেখুন সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, অ্যান্টি-ডুরিং, পৃ-১২২)

কমিউনিস্টরা যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের উত্তরসূরি তাকে আজ এঙ্গেলসের উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পুনরায় যাচাই করে মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে হবে। 'অতীতের সবকিছুই ভুল' – এরকম নৈরাজ্যবাদী নীতির চূড়ান্ত পরিণতি হবে বিলুপ্তি। এ ধরনের পথে বিলুপ্তি হবে অপেক্ষাকৃত দ্রুত ছিন্নভিন্ন হয়ে পচনের মাধ্যমে বিলুপ্তি। আবার 'অতীতের সবকিছুই ঠিক' – এই দ্বিতীয় পথেরও পরিণতি হবে বিলুপ্তি। এই পথে বিলুপ্তি আসবে ধীরে ধীরে, প্রথমে মৃত্যু এবং পরে মমি বা ফসিলে পরিণত হয়ে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ও আশা করি বামপন্থী ও কমিউনিস্টরা বিলুপ্ত হবেন না, বরং সৃজনশীলভাবে বিকশিত, নবায়িত ও পুনর্জাগরিত হবেন।

টমাস পিকেটি : এ যুগের 'আধুনিক মার্কস?'

এবার পিকেটির আলোচনায় আসা যাক। আমার বর্তমান লেখার শিরোনামের প্রথমাংশ হচ্ছে 'একবিংশ শতকে পুঁজি'। ঠিক এই নামে ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটির একটি 'বেস্ট সেলার (Best Seller) গ্রন্থ আছে। ৭০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ক্যাপিটালের প্রচ্ছদের আদলে প্রথম প্রকাশিত হয় ফরাসি ভাষায় ২০১৪ সালের মার্চ মাসে। এরপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর ইউরোপিয়ান স্টাডিজ'-এর সঙ্গে জড়িত আরথার গোল্ড হ্যামারকে পিকেটি এটি অনুবাদের প্রস্তাব দেন। ততদিনে এই তরুণ ফরাসি গবেষকের এই শ্রমসাধ্য (১৯৯৮-২০১৩) এক যুগের অসাধারণ কাজটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষগুলোতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে। একসময় হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত সেমিনারের পরে পিকেটির দেওয়া এই অনুবাদের প্রস্তাবে গোল্ড হ্যামার সানন্দে সম্মতি দেন। উল্লেখ্য, গোল্ড হ্যামার একজন পেশাদার অনুবাদক, যাকে 'ফ্রেঞ্চ অ্যামেরিকান' ফাউন্ডেশন এ যাবৎ তাঁর অনুবাদকর্মের জন্য চার-চারবার পুরস্কৃত করেছে। সুতরাং মাতৃভাষায় প্রণীত একটি মহৎ সময়োচিত কর্ম সুচারুভাবে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পৃথিবীজুড়ে বিপুল সাড়া তোলে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ৭০০ পৃষ্ঠার এই বেস্ট সেলার প্রায় তিন লাখ কপি বিক্রি হয়ে যায়। তবে এর পাঠক প্রধানত উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই বেশি ছিল। পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা অধ্যাপকেরা এর প্রশংসনীয় ও কখনো কখনো তীব্র সমালোচনামূলক পর্যালোচনা লিখতে শুরু করে। আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমস, ইংল্যান্ডের গার্ডিয়ান এবং সুপরিচিত রক্ষণশীল পত্রিকা দ্য ইকোনমিস্ট-এ পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর মতামত প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই প্রখ্যাত মতামত জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে একদিকে যেমন আছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতির অধ্যাপক পল ক্রুগম্যান, তেমনি আরেক প্রান্তে আছেন বিশ্ববিখ্যাত ধনী উদ্যোক্তা বিল গেটস। বামপন্থী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ প্রভাত পাটনায়েকও এই বইয়ের একটি বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। বিশ্বের অন্যতম রক্ষণশীল ধনবাদের প্রবক্তা দ্য ইকোনমিস্ট পত্রিকার ৪ঠা মে ২০১৪ সালের সংখ্যায় যে মন্তব্যটি প্রকাশিত হয় তাতে দাবি করা হয় যে পিকেটি হচ্ছেন

'আধুনিক কার্ল মার্কস'।

আসলে ১৯৯০ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর উন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাদের পক্ষে যে 'উচ্ছ্বাস' উঠেছিল, পিকেটির বই তাতে একটি প্রবল কার্যকর আঘাত হানতে সক্ষম হয়। অবস্থাটি বোঝার জন্য ইকোনমিস্টের মন্তব্যের পুরো উদ্ধৃতিটি আমি নিচে তুলে ধরলাম,

'It is the economics book taking the world by storm. 'Capital in the twenty first century' written by a French Economist was published in French last year and in March of this year. The English version quickly became an unlikely best seller, has prompted a broad and energetic debate on the book's subject : the outlook for global inequality. Some reckon it heralds or may itself cause a pronounced shift in the focus of economic policy, toward distributional questions. This newspaper has hailed Mr. Piketty as 'The Modern Marx' (Karl that is). But what is it all about?' [Economist, 4th May, 2014]

'এটি অর্থনীতির একটি বই যা সারা পৃথিবীতে ঝড় তুলেছে। 'একবিংশ শতকে পুঁজি' একজন ফরাসি অর্থনীতিবিদ কর্তৃক লিখিত। এটি গত বছর ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং এ বছর মার্চ মাসে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ইংরেজি অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত 'সর্বাধিক বিক্রিত' বইয়ে (Best Seller) পরিণত হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু 'বৈশ্বিক বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে একটি উদ্দীপ্ত ও বিস্তৃত বিতর্কের সূচনা করেছে অথবা অন্যভাবে বলা যায় অর্থনৈতিক নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনার মনোযোগবিন্দুকে পুনরায় বণ্টনের ইস্যুতে ফিরিয়ে এনেছে। এই পত্রিকা জনাব পিকেটিকে 'আধুনিক যুগের মার্কস' (অর্থাৎ কার্ল) হিসেবে আবাহন করেছে। কিন্তু এত সবকিছু কিসের জন্য?' [ইকোনমিস্ট, ৪ঠা মে, ২০১৪]

এই বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য চয়ন সুদূর ইতিহাসের গভীরে দৃষ্টিপাত – প্রায় আড়াই শতাব্দীব্যাপী (১৭৭০-২০১০) আয় ও সম্পদের গতিপ্রকৃতির সুবিপুল তথ্যনিষ্ঠ চিত্র প্রণয়ন। পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে 'পুঁজির জন্ম শৈশব বিকাশ, সর্বশেষ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে এমন একটি মহাকাব্যিক প্রক্ষেপণ এর আগে মার্কস ছাড়া কেউই করার চেষ্টা করেননি।' নয়া-ধ্রুপদি স্কুলের একজন অর্থনীতিবিদ যখন সংজ্ঞাগত সীমাবদ্ধতাসহ এটা করলেন, তখন তা প্রচলিত নয়া ধ্রুপদি অর্থনীতি এবং তার চেয়েও অধিকতর রক্ষণশীল নব্য উদারবাদী তথাকথিত 'মুক্ত বাজার অর্থনীতির' মর্মমূলে গিয়ে আঘাত হেনে তাকে অবশ করে দিল। একই সঙ্গে তা উত্তর আধুনিকবাদের মহা আখ্যানবিরোধী অবস্থানকেও প্রবল একটি ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছে। এতকাল নব্য ধ্রুপদি অর্থনীতি বলে এসেছিল যে আয় বা সম্পদ 'বৈষম্য' পুঁজির বিকাশের জন্মলগ্নে একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং পুঁজিবাদী উন্নয়ন বা শিল্পায়নের অনিবার্য অনুষঙ্গ, কারণ প্রথম দিকে শ্রম সরবরাহ থাকে প্রচুর এবং পুঁজি থাকে আপেক্ষিকভাবে দুষ্প্রাপ্য – তাই শ্রমের দাম স্বাভাবিকভাবেই হবে কম এবং পুঁজির 'রেট অব রিটার্ন' বা 'প্রাপ্তি হার' হবে বেশি। এটাই বাজারের চাহিদা-সরবরাহের প্রাকৃতিক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তাই শৈশবে পুঁজির বিকাশ ঘটে সংযোজিত মূল্যের বড় অংশটি গ্রাস ও বিনিয়োগের মাধ্যমে। শ্রম অঢেল থাকবে যতদিন ততদিন বাজারের নিয়মানুযায়ী শ্রমের প্রকৃত মজুরি নিম্নমাত্রায় স্থবির হয়ে থাকবে শ্রমের পুনরুৎপাদন ব্যয় বা শ্রমের ভরণপোষণ খরচটুকুই শুধু শ্রমিক পাবে। এই পর্যায়ে পুঁজি ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়লেও সেই বাড়তি উৎপাদনশীলতার বেশির ভাগ বা পুরো ফলই পুঁজিপতিদের পকেটেই জমা হতে থাকবে। তবে তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, তার একটি দীর্ঘমেয়াদি সুফল আছে। কারণ পুঁজিপতিরা ধনী হওয়ায় তাদের সঞ্চয় হার হবে বেশি এবং তারাই মুনাফার প্রণোদনায় নিয়ত তাদের বাড়তি সঞ্চয় উৎপাদনশীল

'আধুনিক কার্ল মার্কস'।

আসলে ১৯৯০ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর উন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাদের পক্ষে যে 'উচ্ছ্বাস' উঠেছিল, পিকেটির বই তাতে একটি প্রবল কার্যকর আঘাত হানতে সক্ষম হয়। অবস্থাটি বোঝার জন্য ইকোনমিস্টের মন্তব্যের পুরো উদ্ধৃতিটি আমি নিচে তুলে ধরলাম,

'It is the economics book taking the world by storm. 'Capital in the twenty first century' written by a French Economist was published in French last year and in March of this year. The English version quickly became an unlikely best seller, has prompted a broad and energetic debate on the book's subject : the outlook for global inequality. Some reckon it heralds or may itself cause a pronounced shift in the focus of economic policy, toward distributional questions. This newspaper has hailed Mr. Piketty as 'The Modern Marx' (Karl that is). But what is it all about?' [Economist, 4th May, 2014]

'এটি অর্থনীতির একটি বই যা সারা পৃথিবীতে ঝড় তুলেছে। 'একবিংশ শতকে পুঁজি' একজন ফরাসি অর্থনীতিবিদ কর্তৃক লিখিত। এটি গত বছর ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং এ বছর মার্চ মাসে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ইংরেজি অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত 'সর্বাধিক বিক্রিত' বইয়ে (Best Seller) পরিণত হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু 'বৈশ্বিক বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে একটি উদ্দীপ্ত ও বিস্তৃত বিতর্কের সূচনা করেছে অথবা অন্যভাবে বলা যায় অর্থনৈতিক নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনার মনোযোগবিন্দুকে পুনরায় বণ্টনের ইস্যুতে ফিরিয়ে এনেছে। এই পত্রিকা জনাব পিকেটিকে 'আধুনিক যুগের মার্কস' (অর্থাৎ কার্ল) হিসেবে আবাহন করেছে। কিন্তু এত সবকিছু কিসের জন্য?' [ইকোনমিস্ট, ৪ঠা মে, ২০১৪]

এই বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য চয়ন সুদূর ইতিহাসের গভীরে দৃষ্টিপাত – প্রায় আড়াই শতাব্দীব্যাপী (১৭৭০-২০১০) আয় ও সম্পদের গতিপ্রকৃতির সুবিপুল তথ্যনিষ্ঠ চিত্র প্রণয়ন। পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে 'পুঁজির জন্ম শৈশব বিকাশ, সর্বশেষ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে এমন একটি মহাকাব্যিক প্রক্ষেপণ এর আগে মার্কস ছাড়া কেউই করার চেষ্টা করেননি।' নয়া-ধ্রুপদি স্কুলের একজন অর্থনীতিবিদ যখন সংজ্ঞাগত সীমাবদ্ধতাসহ এটা করলেন, তখন তা প্রচলিত নয়া ধ্রুপদি অর্থনীতি এবং তার চেয়েও অধিকতর রক্ষণশীল নব্য উদারবাদী তথাকথিত 'মুক্ত বাজার অর্থনীতির' মর্মমূলে গিয়ে আঘাত হেনে তাকে অবশ করে দিল। একই সঙ্গে তা উত্তর আধুনিকবাদের মহা আখ্যানবিরোধী অবস্থানকেও প্রবল একটি ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছে। এতকাল নব্য ধ্রুপদি অর্থনীতি বলে এসেছিল যে আয় বা সম্পদ 'বৈষম্য' পুঁজির বিকাশের জন্মলগ্নে একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং পুঁজিবাদী উন্নয়ন বা শিল্পায়নের অনিবার্য অনুষঙ্গ, কারণ প্রথম দিকে শ্রম সরবরাহ থাকে প্রচুর এবং পুঁজি থাকে আপেক্ষিকভাবে দুষ্প্রাপ্য – তাই শ্রমের দাম স্বাভাবিকভাবেই হবে কম এবং পুঁজির 'রেট অব রিটার্ন' বা 'প্রাপ্তি হার' হবে বেশি। এটাই বাজারের চাহিদা-সরবরাহের প্রাকৃতিক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তাই শৈশবে পুঁজির বিকাশ ঘটে সংযোজিত মূল্যের বড় অংশটি গ্রাস ও বিনিয়োগের মাধ্যমে। শ্রম অঢেল থাকবে যতদিন ততদিন বাজারের নিয়মানুযায়ী শ্রমের প্রকৃত মজুরি নিম্নমাত্রায় স্থবির হয়ে থাকবে শ্রমের পুরুৎপাদন ব্যয় বা শ্রমের ভরণপোষণ খরচটুকুই শুধু শ্রমিক পাবে। এই পর্যায়ে পুঁজি ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়লেও সেই বাড়তি উৎপাদনশীলতার বেশির ভাগ বা পুরো ফলই পুঁজিপতিদের পকেটেই জমা হতে থাকবে। তবে তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, তার একটি দীর্ঘমেয়াদি সুফল আছে। কারণ পুঁজিপতিরা ধনী হওয়ায় তাদের সঞ্চয় হার হবে বেশি এবং তারাই মুনাফার প্রণোদনায় নিয়ত তাদের বাড়তি সঞ্চয় উৎপাদনশীল

কাজে বিনিয়োগ করে যাবে। এই সুবাদেই শেষ পর্যন্ত একসময় গ্রাম থেকে শ্রম সরবরাহের উৎস শুকিয়ে যাবে এবং গ্রামে মজুরি বাড়তে শুরু করবে এবং তখন আরও বিকাশের জন্য পুঁজির আরও শ্রমের প্রয়োজন হলে শহরে মজুরি না বাড়িয়ে পুঁজিপতির আর উপায় থাকবে না। এই নতুন পর্যায়ে যখন সমাজে পুঁজি আর দুষ্প্রাপ্য নয় শ্রমই দুষ্প্রাপ্য, তখন পুঁজির আয়ের তুলনায় শ্রমের আয়ের অংশ (মূল্য সংযোজনে) নতুন করে বাড়তে শুরু করবে এবং পুঁজির 'প্রাপ্তিহার' ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনশীলতা বিধি অনুযায়ী আবার কমতে শুরু করবে। এই সমগ্র বিবর্তনটি ঘটবে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী। তাই অনিবার্য বৈষম্য বৃদ্ধি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উন্নতির কারণেই অনিবার্যভাবে শেষাবধি বৈষম্য হ্রাসে পরিণত হবে। সুতরাং সাময়িক বৈষম্য বৃদ্ধি নিয়ে দুশ্চিন্তার তেমন কিছু নেই। এ হচ্ছে উন্নয়নের গর্ভযন্ত্রণামাত্র।

ঠান্ডা যুদ্ধের যুগে পুঁজিপতিদের জন্য এ তত্ত্বটি ছিল খুবই গ্রহণযোগ্য এক তত্ত্ব। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পুঁজিবাদী উন্নয়নের জন্য এই তত্ত্বকে তারা তখন কাজে লাগান প্রবল উৎসাহে। ১৯৫৫ সালে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে আমেরিকার জাতীয় আয় ও তার বণ্টনের উপাত্ত ঘেঁটে তা চমৎকারভাবে প্রমাণ করেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেৎস। এই কাজের জন্য তাঁকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয়। তারপর থেকে আয় ও সম্পদবৈষম্য দিয়ে কথা উঠলেই অর্থনীতিবিদদের মূলধারার সদস্যরা বলতে থাকেন এটি হচ্ছে একটি 'প্রয়োজনীয় মন্দ কাজ' কিন্তু কেউই এই প্রশ্ন তখন তোলেননি বা তুলতে ভুলে যান যে :

১. অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে আয়বৈষম্য যে কমার কথা তা আসলেই কি সত্য? ১৯৫৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত যে তথ্য নিয়ে কুজনেৎস আমেরিকার ক্ষেত্রে এটি দেখিয়েছিলেন (যে তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনীতির টেক্সট বইয়ে 'কুজনেৎস কার্ভ' বা বেল কার্ভের বা 'ইনভার্টেড ইউ' চিত্রের উদ্ভব) তা কি আমেরিকান-ইউরোপীয় পুঁজিবাদের একটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রমী সাময়িক পর্যায়, নাকি আসলেই তা স্বাভাবিক পুঁজিবাদের স্বাভাবিক দীর্ঘমেয়াদি বিধি?

এই অত্যন্ত সহজ-সরল সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক প্রশ্নটি টমাস পিকেটি তাঁর গ্রন্থে উত্থাপন করেছেন। তারপর তিনি নিজেই এর উত্তরটি যে ভাষায় তুলে ধরেছেন তা আমি হুবহু উদ্ধৃত করছি :

'Nevertheless, the magical Kuznets curve theory was formulated in large part for the wrong reasons and its empirical under pinning were extremely fragile. The sharp reduction in income inequality that we observe in almost all the rich countries between 1914 and 1945 was due above all to the world wars and the violent economic and political shocks they entailed (especially for people with large fortunes). It had little to do with thc tranquil process of inter sectoral mobility described by Kuznets.' [Thomas Piketty, 2014, P-14]

'এতদ্‌সত্ত্বেও জাদুকরি কুজনেৎস কার্ভটি প্রণীত হয়েছিল বহুলাংশে ভুল যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এবং এর তথ্যগত মূল ভিত্তিটিও ছিল খুবই ভঙ্গুর। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমরা প্রায় সব ধনী দেশেই বৈষম্যের যে তীক্ষ্ণ হ্রাসটি দেখতে পাই তার অন্যতম কারণটি ছিল বিশ্বযুদ্ধসমূহ এবং রাজনৈতিক অভিঘাত (বিশেষত বিশাল ভাগ্যের অধিকারী লোকজনদের ওপর)। এর সঙ্গে কুজনেৎস বর্ণিত শান্তিপূর্ণ আন্তঃ খাত গতিশীলতার সম্পর্ক ছিল খুবই নগণ্য।' (টমাস পিকেটি, ২০১৪, পৃ-১৪)

পিকেটি কুজনেৎসকে সমালোচনা করার পাশাপাশি বলতে চেয়েছেন যে মার্কস ছিলেন উনবিংশ শতকের গবেষক। সেই সময় মার্কস পুঁজির শৈশব ও বিকাশ (শিল্প বিপ্লবের যুগ) লক্ষ্য করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পুঁজির পরবর্তী অনিবার্যতা হচ্ছে আয় ও সম্পদের আপেক্ষিক বৈষম্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের ঘনীভবন এবং অবশেষে বিপ্লব। সেটাও কিন্তু অনেকাংশে সত্য হয়নি।

যদিও এ ধরনের চিন্তা মোটামুটিভাবে তখনকার জন্য বাস্তবভিত্তিকই ছিল। কিন্তু মার্কস যেই নতুন বাস্তবতা দেখে যেতে পারেননি, সেটা হচ্ছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিকভাবে অভিজ্ঞ বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির পরবর্তী রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো। সে সবের অভিঘাতে পুঁজি যে সাময়িকভাবে তখন নবজীবনপ্রাপ্ত হতে পারে সে সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই মার্ক্সের নজরে আসেনি এবং আসা হয়তো সম্ভবও ছিল না।

অন্যদিকে কুজনেৎসের অনুসারীরা পুঁজির শৈশবকালীন সংকটকে অতীত ইতিহাস হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে দাবি করেছেন যে পরবর্তী সময়ে পুঁজির বা সম্পদের সাময়িক বণ্টনবৈষম্য হ্রাসই হচ্ছে পুঁজির বিকাশের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তথ্য অনুযায়ী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ১৯১৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আয় ও সম্পদবৈষম্য হ্রাস পেয়ে অনেকদিন নিচুমাত্রায় থাকলেও ১৯৭০-এর পর থেকে তা পুনরায় অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকে এবং ২০১০ সাল নাগাদ তা আবার সেই উনবিংশ শতকের অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তাই পিকেটির মতে, ১৯১৪-১৯৪৫-এর বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদের সাময়িক সাফল্য দেখে মার্কসকে প্রত্যাখ্যানের কোনো কারণ নেই। সত্য বলতে হলে আমাদের বলা উচিত যে মার্কসের চিহ্নিত পথেই ১৯৭০-এর পর পুঁজির বিকাশ আবার শুরু হয়েছে। যা এখন ২০১০ সাল নাগাদ গণতন্ত্র এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য পুনরায় হুমকিতে পরিণত হয়েছে। পিকেটির এই সত্তর-পরবর্তী নতুন তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণটি তাঁর গ্রন্থের সূচনা বক্তব্যেই চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পিকেটির গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টির শিরোনাম হচ্ছে :

'From Marx to Kuznets or Apocalypse to Fairy Tale'

('মার্কস থেকে কুজনেৎস অথবা কেয়ামত থেকে রূপকথা')

বোঝা যাচ্ছে মার্কসের বিশ্লেষণে যদি পুঁজিবাদের চেহারা হয় 'কেয়ামতের' মতো, তাহলে মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা কুজনেৎসের কার্ভকে আশ্রয় করে পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে শান্তিপূর্ণ মসৃণ সুষম উন্নয়নের স্বপ্ন তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে নেহাতই এক 'রূপকথা'র মতো। 'কেয়ামত' ও 'রূপকথা' উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে পিকেটি লিখেছেন :

'Turning from the nineteenth century analysis of Ricardo and Marx to the twentieth-century analysis of Simon Kuznets, we might say that economists no doubt overly developed taste for apocalyptic predictions, gave way to a similarly excessive fondness for fairy tales, or at any rate happy endings. According to Kuznet's theory income inequality would automatically decrease in advanced phases of capitalist development, regardless of economic policy choices or other differences between countries until eventually it stabilized at an acceptable level.' [Thomas Piketty, P-11]

(উনবিংশ শতকে রিকার্ডো ও মার্কসের বিশ্লেষণ থেকে বিংশ শতকে কুজনেৎসের বিশ্লেষণের দিকে অর্থনীতিবিদেরা যখন ঝুঁকতে শুরু করলেন তখন তাদের জন্য 'পুঁজিবাদে কেয়ামত হবে' জাতীয় চরম ভবিষ্যদ্বাণীর বদলে একই রকম কায়দায় অত্যন্ত প্রিয় বিষয় হয়ে পড়ল কতিপয় রূপকথা বা একধরনের 'মধুরেণ সমাপয়েতের' গল্প। কুজনেৎসের তত্ত্ব অনুসারে, আয়বৈষম্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে হ্রাস পাবে, তা সেসব দেশের অনুসৃতব্য অর্থনৈতিক নীতিমালা যাই হোক না কেন বা দেশে দেশে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন। (তার মতে) ক্রমে ক্রমে আয়বৈষম্য (এসব দেশে) একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় গিয়ে স্থিতিশীল হবে। (টমাস পিকেটি, পৃঃ ১১)

কুজনেৎস সম্পর্কে পিকেটির যে অভিযোগ, প্রায় একই রকম অভিযোগ মার্কসের বিরুদ্ধেও। পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস কথিত আপেক্ষিক ও চরম স্থবিরতার যেসব যুক্তি রয়েছে

সেগুলোর আপেক্ষিকতা, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভরতা, সর্বোপরি অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যা থেকে সেগুলোকে মুক্ত করে দেখার প্রয়োজন তুলে ধরেছেন পিকেটি। তাঁর মতে, প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং তখন প্রবৃদ্ধির হারও বেড়ে যায়। তখন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফল কতটুকু পুঁজির মালিকেরা পাবেন তা প্রথমত নির্ভর করবে পুঁজির প্রাপ্তিহার কত উঁচু তার ওপর। কিন্তু পুঁজি ঘন অবস্থায় অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁজির আবির্ভাবের কারণে পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার হার কম থাকে। এর ওপর কল্যাণ পুঁজিবাদের নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্র যদি পুঁজিপতিদের ওপর প্রগতিশীল ট্যাক্স নীতি প্রয়োগ করে, নানা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে যদি সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যদি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উত্তরাধিকারের সময় পুঁজিপতিদের রেখে দেওয়া সম্পদ খণ্ডীকরণের মাধ্যমে পুনর্বণ্টিত হয়, তাহলে স্বাভাবিক আয় ও সম্পদবৈষম্যের প্রবণতাটি নাও অগ্রসর হতে পারে। এই লাগামগুলোই হতে পারে পুঁজিবাদের সাময়িক রক্ষাকবচ। একটি সহজ গাণিতিক উদাহরণ দিয়ে পিকেটি দেখান যে পুঁজির ভাগ্যে জাতীয় আয়ের শেয়ার কতটুকু জুটবে তা নির্ভর করছে পুঁজির রেট অব রিটার্ন (r), জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হারের (g) এবং সঞ্চয়ের হার 's'-এর ওপর। তার প্রদত্ত মডেলে সমীকরণ দুটি হচ্ছে যথাক্রমে :

$$(১)\ \alpha = r\cdot\beta \quad (২)\ \ \beta = \frac{s}{g} \qquad \therefore \alpha = r\cdot\frac{s}{g}$$

যেখানে

ক. α = জাতীয় আয়ে পুঁজির হিস্যা অর্থাৎ আলফা বেশি হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে জাতীয় আয়ে শ্রমের হিস্যা কম হবে অর্থাৎ আয় ও সম্পদবৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু পুঁজিলব্ধ আয়ের বণ্টনবৈষম্য শ্রমলব্ধ আয়ের বণ্টনবৈষম্য মাত্রার চেয়ে অনেক উঁচু।

খ. r = পুঁজির প্রাপ্তি হার বা রেট অব রিটার্ন

গ. g = প্রবৃদ্ধির হার

ঙ. s = সঞ্চয়ের হার = মোট সঞ্চয় / মোট জাতীয় আয়

পিকেটি এই সহজ-সরল মডেলকে টেস্ট করার জন্য বহু বছর পরিশ্রম করে (প্রায় এক যুগ) সারা দুনিয়ার r এবং g-এর দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার তথ্য সংগ্রহ করে তাদের গতিপ্রবণতার প্রক্ষেপণ করেছেন। নিচের চিত্রলেখটি পিকেটির তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

নিচের চিত্রটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাক্ শিল্প বিপ্লব যুগে (১৫০০-১৭০০ সাল) সাধারণভাবে সম্পদ থেকে আয় (r) ছিল বেশ উঁচুমাত্রায় স্থির, কিন্তু সেই তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার (g) ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ নিচুমাত্রায় স্থির। এই অবস্থায় জাতীয় আয় বাড়বে কম এবং এর বেশির ভাগটাই নিয়ে নেবে সম্পত্তির মালিকশ্রেণি। তাই পিকেটির মডেল অনুসারে প্রাক্ শিল্প বিপ্লব যুগে আয় ও সম্পদ বৈষম্য উচ্চমাত্রায় স্থির হয়ে বিরাজ করবে। শিল্প বিপ্লবের যুগে বা মার্কসের যুগে (১৭০০-১৮২০) চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে নতুন প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে পুঁজির প্রাপ্তিহার (r) তীক্ষ্ণভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হারও বেড়েছে। তবে r তুলনামূলকভাবে বেশি বাড়ায় এই সময় বৈষম্য উচ্চমাত্রায় স্থির না থেকে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় শ্রমজীবীরা চোখের সামনে প্রবৃদ্ধি দেখছেন, কিন্তু তার কোনো অংশ তাদের কাছে আসছে না। ১৮২০-১৯১৩ এই সময়ও দেখা যাচ্ছে r সামান্য কমেছে এবং g বেশ বেড়েছে। এর অর্থ হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের

অগ্রযাত্রার গতি বেড়েছে কিন্তু তার ভাগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের মালিকদের উচ্চ হার খুব সামান্যই হ্রাস পেয়েছে। এরপর ১৯১৩-১৯৫০ আমরা একটি অস্বাভাবিক চিত্র দেখি, যেখানে r দ্রুত নিচে নামছে কিন্তু তারপরও g না কমে বেড়েই চলেছে এবং r-এর ওপরে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থাটাই হচ্ছে শ্রমজীবীদের হিস্যা বৃদ্ধির সময় কিন্তু পিকেটি মনে করেন এটা হচ্ছে একধরনের ব্যতিক্রম, কারণ পুঁজিবাদের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে r > g. পিকেটির চিত্র আরও দেখাচ্ছে যে একবিংশ শতকে r আবার বেড়ে যাবে পক্ষান্তরে প্রবৃদ্ধির হার বা g আরও হ্রাস পাবে। অর্থাৎ r ও g-এর ব্যবধান ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে পিকেটির মতে, ভবিষ্যতে পুঁজির আয় শেয়ার বাড়বে এবং তার ফলে সম্পদ ও আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে, যদি না ১৯১৩-৫০ কালপর্বের মতো কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে।

AFTER-TAX RATE OF RETURN VS. GROWTHRATE AT THE WORLD LEVEL, FROMNTIQUITY UNTIL, 2100

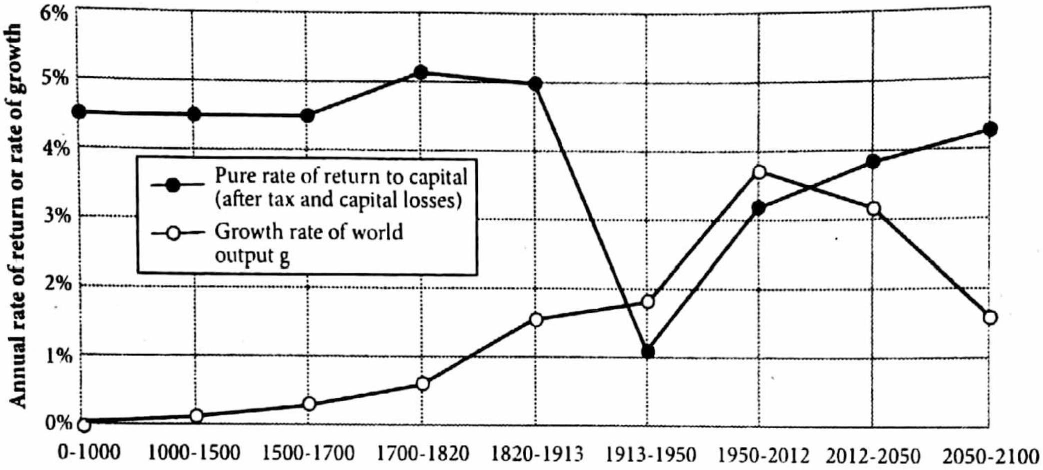

The rate of return to capital (after tax and capital losses) fell below the growth rate during the twenticth century, and may again surpass it in the twenty-first century.

Sources and series : see piketty.psc.ens.fr/capital21c

অঙ্ক থেকে ইতিহাস : মার্কস সম্পর্কে পিকেটি

পিকেটি একদিকে যেমন কুজনেৎসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অন্যদিকে মার্কসের 'চরম পরিণতি' বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীকেও পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। সেখানে নানা শর্ত আরোপ করে পিকেটি লিখেছেন :

'From the First to the sixth decade of the nineteenth century, workers wages stagnated at very low levels-close or even inferior to the eighteenth and previous centuries. This long phase of wage stagnation, which we deserve in Britain as well as in France, stands out all the more because economic growth was acceleration in this period. The capital share of national income-industrial profit, land rents and building rents-insofar as can be estimated with the imperfect sources available today increased considerably in both countries in the first half of the nineteenth century. It would decrease slightly in the final decades of the nineteenth century, as wages partly caught up with growth. The data we have assembled nevertheless reveal no structural decrease in inequality prior to World War I. What we see in the period between 1870-1914 is at best a stabilization of inequality at an extremely

high level and in certain respects an endless in egalitarian spiral, marked in particular by increasing concentration of wealth. It is quite difficult to say where this trajectory would have led without the major economic and political shocks initiated by the war. With the aid of historical analysis and a little perspective we can now see those shocks as the only forces since the industrial revolution powerful enough to reduce inequality. [Thomas Piketty, 1914, P-8]

পিকেটির এই বর্ণনা মার্কসের ক্যাপিটাল ও এঙ্গেলসের 'The conditions of working class in Britain'-এর বর্ণনার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। মার্কসের এই বিশ্লেষণ উনবিংশ শতকের জন্য ঠিক হলেও বিংশ শতকের উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে যে অনেক জায়গাতেই কার্যকর হয়নি, পিকেটির তথ্য সেটাও দাবি করে।

কিন্তু পিকেটি এটাও খেয়াল করেন যে ১৯১৪ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত কতকগুলো ব্যতিক্রমী ঘটনার ফলেই উনবিংশ শতকের এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রবণতার লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমী ঘটনার মধ্যে প্রধান একটি উপাদান হচ্ছে যুদ্ধের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের সম্পত্তির ধ্বংসপ্রাপ্তি। এ থেকে মনে হয় পিকেটি যুদ্ধের দ্বারা অতিরিক্ত পুঁজি ধ্বংস করার মাধ্যমে Capitalism—এর বৈষম্য কমানোর কথা বলছেন, যা অনেকটাই লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীর কাছাকাছি। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদ দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে যে নতুন জীবনীশক্তি পেয়েছিল তার ব্যাখ্যা মার্কসের মধ্যে তখনই পাওয়া না গেলেও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য লেনিন এবং রোজা লুক্সেমবার্গের রচনায় আমরা তার অনেকটাই পেতে পারি। তদনুযায়ী যুদ্ধ যেমন একদিকে পুঁজিবাদকে নতুন জীবনীশক্তি দিয়েছিল, তেমনি বিশ্ব পুঁজিবাদের দুর্বল দুই গ্রন্থিতে বিষয়ীগত শর্ত (Subjective Condition) অনুকূল থাকায় একধরনের সমতা অভিমুখী বিপ্লবের জন্মও দিয়েছিল।

পিকেটি অবশ্য তাঁর গ্রন্থে যুদ্ধ ছাড়াও পুঁজিবাদের আরও কতিপয় বৈষম্য হ্রাসকারী সংস্কারবাদী প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন, যা তাঁর মতে মার্কসের বর্ণিত পুঁজিবাদের ভয়াবহ পরিণতিকে ঠেকিয়ে দিয়েছে অথবা কিছুটা দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হয়েছে। মার্কসের 'অনিবার্য পতনের' বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পিকেটির সুনির্দিষ্ট মন্তব্যটি আমি নিচে তুলে ধরছি :

'Marx's dark prophecy came no closer to being realized than Ricardo's. In the last third of the nineteenth century, wages finally began to increase. The improvement in the purchasing power of workers spread everywhere and this changed the situation radically, even if the extreme inequalities persisted and in some respects continued to increase until World War I, the communist revolution did indeed take place, but in the most backward country in Europe, Russia, where the Industrial Revolution had scarcely begun, where as the most advanced European countries explored other social democratic avenues-fortunately for their citizens. Like his predecessors Marx totally neglected the possibility of durable technological progress and steadily increasing productivity which is a force that can to some extent serve as a counter weight to the process of accumulation and concentration of private capital. He no doubt lacked the statistical data needed to refine his predictions.' [Thomas Pikitty-P-10].

উদ্ধৃতি আর না বাড়িয়ে মার্কসের বিরুদ্ধে পিকেটির আরও যে কটি সামান্য অনুযোগ রয়েছে তা সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরছি :

ক. মার্কস ১৮৪৮ সালেই পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি সম্পর্কে তত্ত্বগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। পরে যখন তিনি পুঁজি গ্রন্থ রচনা করতে যান তখন তার

পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত তাকে পুঁজিবাদ সম্পর্কে 'অনিবার্য ধ্বংসের' মতো চরম অবস্থানের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

খ. মার্কস তাঁর আমলে তাঁর তত্ত্বগুলো যাচাইয়ের জন্য ব্যাপক পরিসংখ্যানও পাননি। তখন 'জাতীয় আয়', 'পুঁজির প্রাপ্তিহার', জাতীয় আয়ে পুঁজির ও শ্রমের হিস্যা, আয় বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য, ইত্যাদি সামষ্টিক চলকের পরিমাণ ও পরিসংখ্যানও মার্কসের পক্ষে বিচার করা সম্ভব হয়নি। হয় তখনো এগুলো পরিমিতই হয়নি অথবা পরিমিত হলেও তা মার্কসের নাগালে আসেনি।

পিকেটির তথ্য অবশ্য ১৯৭০-এর পর আবার দেখাচ্ছে যে পুঁজিবাদী সব উন্নত দেশেই মার্কসের 'প্রেতাত্মা' পুনরায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের গড় বৈষম্য সাধারণভাবে অতি উচ্চ মাত্রায় উপনীত হলেও একেক দেশে বৈষম্যের সুনির্দিষ্ট পরিমাপটি একেক রকম। তাই এই সাধারণ সত্যের রকমফেরকে শুধু পুঁজিবাদের সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়ম বা পুঁজির নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পিকেটি নিজেই বলেছেন,

'As I explained earlier I began this work by collecting sources and establishing historical time series pertaining to distribution of income and wealth. As the book proceeds, I sometimes appeal to theory and to abstract models and concepts, but I try to do so sparingly and only to the extent that theory enhances our understanding of the changes we observe.' [Thomas Piketty, 2014, P-33]

এ জন্য রক্ত-মাংসের পুঁজিবাদের বিকাশের মডেলে রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় পলিসি, শ্রেণিসংগ্রাম, পুঁজির বিশ্বায়ন মাত্রা ইত্যাদিকেও এযাবৎ অবহেলিত কিন্তু বর্তমানে যথেষ্ট প্রভাবশালী নির্ধারক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমরা যদি জীবন্ত গতিশীল সত্যকে বুঝতে চাই তাহলে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখাকে (শুধু অর্থনীতি নয়) ব্যবহার করে অগ্রসর হতে হবে। পিকেটির বইয়েও এমনকি নানা ধরনের সাহিত্যের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে মার্কসের প্রিয় ফরাসি লেখক বালজাকের একটি উপন্যাসকেও (বালজাক, ১৮৩৫) সেই যুগের সমাজচিত্র বর্ণনার জন্য খুবই সৃজনশীলভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন।

আত্মস্বীকারোক্তিতে পিকেটি বলেছেন যে তাঁর ১৮ বছর বয়স হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। সেটি ছিল ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী, একই সঙ্গে সেটি ছিল 'বার্লিন প্রাচীরের' পতনের বছর। এই অবস্থায় প্রথমে পিকেটি অন্য অনেক প্রতিভাবান অর্থনীতিবিদদের মতো 'আমেরিকাকেই' আদর্শ চাকরি ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শিগগিরই তাঁর উপলব্ধি বদলাতে শুরু করে। ২২ বছর বয়সে তিনি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি নিয়েছিলেন, কিন্তু ২৫ বছর বয়সেই তিনি চাকরি ছেড়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় তাঁর অনুভূতির বর্ণনা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে :

'I did not find the work of US economists entirely convincing. To be sure they were all very intelligent, and I still have many friends from that period of my life. But something strange happened. I was only too aware of the fact that I knew nothing at all about the world's economic problems ... ... The truth is that economics should never have sought to divorce itself from other social sciences and can advance only in conjunction with them. The social sciences collectively know too little to waste time on foolish disciplinary squabble. If we are to progress in our understanding of the historical dynamics of wealth distribution and the structure of social classes, we must obviously take a pragmatic approach and avail ourselves of the methods of historians, sociologists and political scientists as well as economist. We must start with fundamental questions and try to answer them.

Disciplinary disputes and turf wars are of little or no importance. In my mind this book is as much a work of history and economics.' [Thomas Piketty, 2014 P-32-33]

উন্নত পুঁজিবাদের মধ্যে বৈচিত্র্য

পিকেটির হিসাব অনুযায়ী, 'স্ক্যান্ডিনেভীয় পুঁজিবাদী' দেশগুলো হচ্ছে 'স্বল্প বৈষম্যের পুঁজিবাদী দেশ'। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলো হচ্ছে 'উচ্চ বৈষম্যের দেশ'। আর পিকেটির ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও তীব্রতর হবে। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমি পিকেটির অসংখ্য তালিকা ও গ্রাফ থেকে মাত্র তিনটি তালিকা ও গ্রাফ নিচে তুলে ধরছি। ১ নম্বর তালিকায় প্রথমে দেখানো হয়েছে 'শ্রমলব্ধ আয়ে' বণ্টন বৈষম্যের চিত্র। ২ নম্বর তালিকায় দেখানো হয়েছে 'পুঁজির মালিকানার' বৈষম্য। ৩ নম্বর তালিকায় দেখানো হয়েছে উপরিউক্ত দুই ধরনের উৎসের আয় মিলিয়ে মোট আয়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান বণ্টন বৈষম্য। তথ্যগুলো মূল গ্রন্থে যেভাবে উত্থাপিত হয়েছে হুবহু সেভাবেই আপাতত আমি এখানে উত্থাপন করছি।

TABLE 1

Inequality of Labor income across time and space

Share of different groups in total labor income	Low inequality (=Scandinavia, 1970s-1980s	Medium inequality (=Europe 2010)	High inequality (=US2010)	Very high inequality (=US 2030s)
The top 10% ('upper class')	20%	25%	35%	45%
Including the top 1% ('dominant				
class')	5%	7%	12%	17%
Including the next 9% ('well-to-do class')	15%	18%	23%	28%
The middle 40% ('middle class')	45%	45%	40%	35%
The bottom 50% ('lower class')	35%	30%	25%	20%
Corresponding Gini (synthetic inequality index)	0.9	0.26	0.36	0.46

Note: In societies where labor income inequality is relatively low (such as in Scandinavian countries in the 1970s-1980s), the top 10% most well paid receive about 20% of total labor income, the bottom 50% least well paid about 35%, the middle 40%. The corresponding Gini index (a synthetic inequality index with values from o to 1) is equal to 0.19. See the online technical appendix.

TABLE 2

Inequality of capital/ ownership across time and space

Share of different groups in total capital	Low inequality (never observed; ideal society?)	Medium inequality (=Scandinavia, 1970s-1980s)	Medium-high inequality (=Europe 2010)	High inequality (=US2010)	Very high inequality (=Europe 1910)
The top 10% ('upper class')	30%	50%	60%	70%	90%
Including the top 1% ('dominant class')	10%	20%	25%	35%	50%
Including the next 9% ('well-to-do class')	20%	30%	35%	35%	40%
The middle 40% ('middle class')	45%	40%	35%	25%	5%
The bottom 50% ('lower class')	25%	10%	5%	5%	5%
Corresponding Gini coefficient (synthetic inequality index)	0.33	0.58	0.67	0.73	0.85

Note: In societies 'medium' inequality of capital ownership (such as Scandinavian countries in the 1970s-1980s), the top 10% richest in wealth own about 50% of aggregate wealth, the bottom 50% poorest about 10%, and the middle 40% about 40%. The corresponding Gini coefficient is equal to 0.58. See the online technical appendix.

TABLE 3

Inequality of total income {labor and capital) across time and space

Share of different groups in total capital income (labor + capital)	Low inequality (=Scandinavia, 1970s-1980s)	Medium inequality (=Europe 2010)	High inequality (=US 2010, Europe 1910)	Very high inequality (=US 2030?)
The top 10% ('upper class')	25%	35%	50%	60%
Including the top 1% ('dominant class')	7%	10%	20%	25%

Including the next 9% ('well-to- do class')	18%	30%	30%	35%
The middle 40% ('middle class')	45%	40%	30%	25%
The bottom 50% ('lower class')	30%	25%	20%	15%
Corresponding Gini coefficient (synthetic inequality index)	0.26	0.36	0.49	0.58
Note: In societies where the inequality of total income is relatively low (such as Scandinavian countries in the 1970s-1980s), the 10% highest incomes receive about 10% of total income, the 50% lowest incomes receive about 30%. The corresponding Gini coefficient is equal to 0.26. See the online technical appendix. Source: Thomas Piketty, 20/4, P: 247-249J				

তালিকাগুলো লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সারা বিশ্বকে এখানে বৈষম্যের মাত্রার বিচারে তিন ধরনের রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিভক্ত করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছ সাধারণভাবে স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোতে বৈষম্য মাত্রা সবদিক দিয়েই সবচেয়ে কম। সাধারণভাবে মধ্যম মাত্রার বৈষম্য বিরাজ করছে ইউরোপীয় দেশগুলোতে। আর উচ্চ মাত্রার বৈষম্য বিরাজ করছে আমেরিকাতে। পিকেটির তুলে ধরা তিন ধরনের বৈষম্যের চিত্র আবার তিন রকম বিষয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে :

শ্রমলব্ধ আয়, পুঁজির মালিকানা এবং মোট আয়। প্রথম তালিকায় রয়েছে শ্রমলব্ধ আয়ের বৈষম্যের চিত্র।

শ্রমলব্ধ আয়বৈষম্য হচ্ছে সাধারণ যুক্তিতে শ্রমের পরিমাণ বা গুণভিত্তিক (Meritocratic Inequality) বৈষম্য। এ ধরনের বৈষম্য হয়তো সাম্যবাদের নিম্ন পর্যায়ে মার্কসবাদীরাও একধরনের বুর্জোয়া অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন এবং সমাজতন্ত্রের নানা এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতার পর এখন বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো প্রায় পুরোপুরিই গ্রহণ করেছেন বলে আমার ধারণা। যদিও ক্রুশ্চেভকে একসময় এ জন্য সংশোধনবাদের বদনামে ভুগতে হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রেও দেশে দেশে, কালে কালে প্রচুর অতিরিক্ত এবং অন্যায় পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। সমাজের সর্বোচ্চ ১ শতাংশ শ্রমজীবী টেকনোক্র্যাটরা স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে সত্তর-আশির দশকে মোট শ্রমলব্ধ জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ ভোগ করতেন। পিকেটির জন্য এটা গ্রহণযোগ্য বৈষম্য, ইউরোপে ২০১০ সালে এই অংশটি ভোগ করতেন ৭. শতাংশ। আমেরিকায় ২০১০ সালে এই অংশটি ভোগ করতেন ১২ শতাংশ এবং পিকেটির প্রক্ষেপণ অনুসারে ২০৩০ সালে আমেরিকায় এটি বেড়ে গিয়ে হবে ১৭ শতাংশ। পিকেটির তথ্য অনুযায়ী, উলটো করে আমরা যদি শ্রমজীবীদের বাকি ৯৯ শতাংশের শ্রমলব্ধ আয়ের শেয়ার মাপি তাহলে দেখব স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে ৯৯ শতাংশ পাচ্ছেন ৯৫ শতাংশ। ইউরোপে পাচ্ছেন ৯৩ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে পাচ্ছেন মাত্র ৮৮ শতাংশ। ২০৩০ সালে গিয়ে এই আমেরিকায় ৯৯ শতাংশ পাবেন আরও কম অর্থাৎ ৭৭ শতাংশ। পিকেটি প্রশ্ন করেছেন শ্রমলব্ধ আয়ের ক্ষেত্রে শেষোক্ত দেশে এ রকম উচ্চ বৈষম্য হচ্ছে কেন? একটা কারণ হতে পারে শিক্ষার অধিকারে বৈষম্য অর্থাৎ White collar worker বনাম brown collar worker-এর বৈষম্য। আরেকটা কারণ হতে

পারে যারা বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানির সর্বোচ্চ ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের উচ্চ বেতন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আমাদের দেশেও ব্যক্তি খাতে উচ্চ ব্র্যাকেটভুক্তদের বেতনের অস্বাভাবিক উচ্চতা এই প্রবণতারই পরিচয় বহন করে বলে আমার ধারণা। তাদের বেতনের সঙ্গে তাদের শ্রমের পরিমাণ বা গুণের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। তবু কেউ ইচ্ছা করলে দক্ষতার দোহাই দিয়ে এই মাত্রার বৈষম্যকে ন্যায়সংগত (Justified) বা গ্রহণযোগ্য (Acceptable) বলে আখ্যায়িত করতে পারেন। পিকেটিও তা আংশিক মেনে নিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ফরাসি বিপ্লবের পর প্রণীত মানবাধিকার সনদের থেকে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেই কিন্তু তার এই গ্রন্থটি শুরু হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম 'ভূমিকা'র পরই প্রদত্ত এই উদ্ধৃতিটি হচ্ছে :

'Social distinctions can be based on common utility'

(Declaration of the Rights of Man and the Citizen, article I, 1789)

অর্থাৎ সমাজকে যে ব্যক্তি বা নাগরিক যত বেশি উপকার প্রদান করবেন সমাজের কাছ থেকে সেই ব্যক্তি বা নাগরিকের তত বেশি মর্যাদা প্রাপ্য হবে। তবে পিকেটি বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ বেতনবৈষম্যকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এখানে অন্যায়প্রাপ্তি ঘটেছে বলে তার বিশ্বাস। বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে যে ওই সব উচ্চ বেতনভোগী ১ শতাংশ ব্যক্তি মোটা অঙ্কের পুঁজিরও মালিক হয়ে পড়েছেন। তাদের স্টক শেয়ারের দৌলতে এবং তাদের অন্যান্য পুঁজিলব্ধ আয় এতে যুক্ত হওয়াতে এ ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে আরও অনেক বেশি বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই শেষাবধি সমাজের সর্বোচ্চ এক শতাংশ পুঁজির মালিকানা এবং তথাকথিত স্বসংজ্ঞায়িত 'দক্ষতার' বা মানব পুঁজির মালিকানার অজুহাতে সমাজে অন্যায়ভাবে বিপুল মর্যাদার ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশেও বর্তমানে আমরা দেখতে পাই সর্বোচ্চ টেকনোক্র্যাটদের প্রচুর মানব পুঁজি ও অন্যান্য পুঁজিও রয়েছে কিন্তু সেই সব পুঁজির একটি বড় অংশই উৎপাদনমূলক নয়–এর চরিত্র হচ্ছে রিয়াল এস্টেট, স্টক শেয়ার, পেনশন ফান্ড, জমি, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ধরনের। এসব জায়গায় ঝুঁকি কম ও খাজনা আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা সুরক্ষিত। তবে কেউ বলতে পারেন যে এগুলোও অপ্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে হয়তো ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে তা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ এখানে ব্যাঙ্কে প্রচুর অলস অর্থ রয়েছে এবং অনেক অর্থ অপঋণে পরিণত হয়েছে।

আলোচনা আর না বাড়িয়ে পিকেটির ২ ও ৩ নম্বর তালিকায় প্রদত্ত তথ্যাবলি এক সঙ্গে দেখলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমাদের এই বিশ্বে আয়বৈষম্যের প্রধান জনক হচ্ছে পুঁজি এবং পুঁজিলব্ধ আয়ের বৈষম্য। এখানে পিকেটির অভিযোগ হচ্ছে এই পুঁজির বড় অংশটিই ব্যক্তিমালিকানা ও উত্তরাধিকারী ব্যবস্থার কারণে উপার্জিত আয় থেকে তৈরি হয়নি। বিশেষত প্রাচীন ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক প্রতিযোগিতামূলক যুগের পর থেকে তা উত্তরাধিকার প্রক্রিয়ায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হচ্ছে মাত্র। তাই মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পিকেটি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত পুঁজিলব্ধ আয়কে সমমাত্রায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। পিকেটির মতে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী করব্যবস্থা না থাকলে বৈষম্য তাই Cumulative বৈষম্যের পরিণত হয়। তালিকাগুলো থেকে দেখা যাবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক শতাংশ স্ক্যান্ডিনেভীয়রা দেশে নিয়ে নেয় পুঁজির ২০ শতাংশ, ইউরোপে ১৯১০ সালে নিত ৯০ শতাংশ, এখন নেয় ২৫ শতাংশ এবং আমেরিকায় আগে নিত কম, তবে এখন নিচ্ছে ৩৫ শতাংশ। ভবিষ্যতে নেবে ৫০ শতাংশ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩ নম্বর তালিকায় শ্রমলব্ধ ও পুঁজিলব্ধ আয়ের সমন্বয়ে গঠিত তথ্য অনুসারে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের অধীনে আয়ের পরিমাণ বা সামগ্রিক বৈষম্যের পরিমাণটি দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ।

স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পাচ্ছে ২৫ শতাংশ, ইউরোপে এই অংশটি বর্তমানে পাচ্ছে ৩৫ শতাংশ আর আমেরিকায় এই অংশটি পাচ্ছে ৫০ শতাংশ, যেটা অতীতে ইউরোপ ১৯১০ সালে পেত। অতএব ১৯১০ সালের ইউরোপের অনুরূপ ভয়াবহ অবস্থায় বর্তমানে আমেরিকা ফিরে গেছে। পিকেটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ২০৩০ সালে এটি ৬০ শতাংশ হবে।

পিকেটির প্রদত্ত এসব তথ্য আমাদের আগাম সতর্কবাণী প্রদান করছে। এই সতর্ক সঙ্কেতটি হচ্ছে মূলত আমেরিকার প্রতি এবং তার দাবি হচ্ছে যে আমেরিকা ইতিমধ্যেই অগ্রহণযোগ্য এক বৈষম্য মাত্রায় উপনীত হয়েছে এবং তার গতিমুখও আরও বৈষম্য বৃদ্ধির দিকে। তার এ কথা সবাই গ্রহণ নাও করতে পারেন, তথ্য নিয়ে নানা প্রশ্নও থাকতে পারে কিন্তু যখন আমরা দেখি যে সেখানে ১ শতাংশের বিরুদ্ধে ৯৯ শতাংশের আন্দোলন হচ্ছে, যখন ওয়াল স্ট্রিট দখলের স্লোগান উঠতে শুরু করেছে তখন নিশ্চিতভাবেই আমাদের আরেকবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয় আমরা যাচ্ছি কোথায়? হয়তো এ জন্যই নোবেল বিজয়ী আমেরিকান অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান সমাজতন্ত্র বা মার্কসের অনুসারী না হয়েও পিকেটির বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে রায় দিয়েছেন, 'শুধু নিষ্ঠাবান তথ্য সংগ্রহের জন্যই পিকেটিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত!'

পিকেটির সুপারিশ

এ কথা সহজেই অনুমেয় যে 'বৈষম্য' কমাতে হলে 'আয়বৈষম্য' এবং 'সম্পদ বা পুঁজির' মালিকানা বৈষম্য উভয়ই হ্রাস করতে হবে। যখনই শ্রমের উচ্চমূল্য প্রাপকেরা একই সঙ্গে প্রচুর সম্পদেরও মালিক হয়ে যান তখনই চরম বৈষম্যের উদ্ভব ঘটে। তবে অধিকাংশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই 'আয়বৈষম্য'কে আক্রমণের জন্য প্রগতিশীল করব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শ্রমলব্ধ আয়কে তুলনামূলক বিশেষ ছাড়ও দেওয়ার বিধান থাকে। পিকেটি শ্রমলব্ধ আয় নিয়ে অত চিন্তিত নন, তাই পুঁজির বা সম্পদের ওপরই তিনি একটি বৈশ্বিক কর আরোপের প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর মতে, এটি একটি 'ইউটোপিয়ান' কিন্তু 'ইউজফুল আইডিয়া'। পিকেটি লিখেছেন :

'Even if nothing resembling this ideal is put into practice in foreseeable future, it can serve as a worth while reference point, a standard against which alternative proposals can be measured.'

(Thomas Piketty. 2014, P : 515)

পিকেটির দ্বিতীয় পরামর্শ হচ্ছে একটি সামাজিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ করা। এ জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন করতে হবে, সামাজিক রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগতকরণ বা বিনিয়ন্ত্রণের নামে ভেঙে ফেলা চলবে না। মাথাব্যথা হলে মাথা কাটা যে কোনো সমাধান নয়, এটি পিকেটি ভালোভাবেই অনুধাবন করেন। তবে পিকেটি বামপন্থীদের কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাও সমর্থন করেন না।

পিকেটি মনে করেন তাঁর পছন্দনীয় সামাজিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রকে 'অধিকার' ভিত্তিক দর্শন ও চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। পিকেটি 'পুনর্বণ্টন' শব্দের চেয়ে 'সর্বজনীন অধিকারের' ভাষাকে অধিক পছন্দ করেন। 'পুনর্বণ্টনের' নামে খুব ধনী লোকদের কাছ থেকে কিছু 'ভিক্ষা' সংগ্রহ করে বিক্ষুব্ধ মধ্যস্তরের সরব গোষ্ঠীগুলোকে কিছু দিয়ে শান্ত রাখার কৌশলকে পিকেটি সঠিক মনে করেন না। তাই বারবার তাঁর গ্রন্থে 'Patrimonial Middle Class' (আনুকূল্য প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি) এর বিরুদ্ধে অনেক শক্ত মন্তব্য পাওয়া যায়। আনুকূল্য বণ্টনের বিপরীতে আধুনিক বণ্টনের দর্শন

সম্পর্কে বলতে গিয়ে পিকেটি বলেছেন,

'Modern redistribution is built around a logic of rights and a principle of equal access to a certain numbers of goods deemed to be fundamental.' (Thomas Piketty, 2014, P : 479)

তবে এই সর্বজনীন মানবাধিকারগুলো কী হবে, সেখানে রাজনৈতিক মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক মানবাধিকারের ভারসাম্য কতটুকু রক্ষিত হবে এবং সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কোন অধিকারের কতটুকু অগ্রাধিকার থাকবে এসবসূক্ষ্ম বিতর্কের কোনো সমাধান পিকেটির মধ্যে পাওয়া যাবে না। পিকেটির মতে, একটি সামাজিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে প্রধান সূচক হচ্ছে কর/জিডিপি অনুপাত যেটি অনুন্নত দেশে খুবই কম। চীনে অনেক বেশি আর ইউরোপ-আমেরিকায় (স্ক্যান্ডিনেভীয় ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) মাঝামাঝি। এই সূচকটি না বাড়িয়ে অনুন্নত দেশ বা উন্নত ধনী দেশগুলো কখনোই বৈষম্যও কমাতে পারবে না এবং নাগরিকদের জন্যও সর্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে পারবে না। এদিক থেকে বোঝা যায় যে পিকেটি অমর্ত্য সেনের সঙ্গে একমত যে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এবং এটা সম্ভব না হলে বৈষম্যবর্ধক একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি সমাজে চির সক্রিয় থেকে যাবে।

পিকেটির সমালোচনা

পিকেটির সমালোচনা দুদিক থেকে করা সম্ভব। একটি ডান দিক থেকে, আরেকটি বাম দিক থেকে। সংক্ষেপে এই দুই ধারার সম্ভাব্য সমালোচকের মধ্য থেকে দুটি উল্লেখযোগ্য নমুনা সমালোচনা আমি নিচে তুলে ধরছি। একটি সি পি আই (এম)-র তাত্ত্বিক 'সোস্যাল সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার প্রখ্যাত সাবেক সম্পাদক রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়েকের সমালোচনা। অপরটি বিশ্ববিখ্যাত ধনী 'বিল গেটসের'। বিল গেটসের এই সমালোচনাটি অবশ্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি তাঁর ব্যক্তিগত ব্লগে এটির সন্ধান পেয়েছি।

প্রভাত পট্টনায়েক 'The Marxist'-এর 'এপ্রিল-জুন' ২০১৪ সংখ্যায় প্রথম 'Capitalism, Inequality and Globalization : Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century' নামে এক প্রবন্ধে এই সমালোচনাগুলো তুলে ধরেন।

১। পট্টনায়েকের মতে, পিকেটি বর্তমানে পুঁজিবাদে যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের বিপদের কথা বলেছেন সে বিষয়ে মার্কসবাদীরাও একমত কিন্তু পিকেটি এটাকে 'r-g' এর ব্যবধান দিয়ে টেকনিক্যালি যেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেটি সঠিক নয়।

২। পট্টনায়েকের মতে, ক্যাপিটাল না মেপে ক্যাপিটালের রেট অব রিটার্ন মাপা সম্ভব নয়। আবার ক্যাপিটালকে যদি উৎপাদিত উৎপাদনের উপায় বলে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাহলে তার আর্থিক মূল্য মাপতে হলেও আমাদের ক্যাপিটালের রেট অব রিটার্ন জানতে হবে। অর্থাৎ নয়া ধ্রুপদি অর্থনীতির ক্যাপিটাল তত্ত্ব এক অসংশোধনীয় অসংগতিতে ভুগছে। পিকেটি এই ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করায় তিনিও এই ভ্রান্তিতে ভুগছেন।

৩। ১৯১৪-১৯২৯ এই সময়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যাপক মন্দা বিরাজ করছিল। এর অর্থ হচ্ছে তখন নিশ্চিতভাবে অব্যবহৃত কলকারখানা বেশি ছিল, পুঁজির তুলনায় আয়ের পরিমাণ কম ছিল। সুতরাং সেই সময় ক্যাপিটাল-ইনকাম অনুপাতটি কম না হয়ে বেশিই হওয়ার কথা এবং তখন তাহলে ক্যাপিটালের আয়ের হিস্যা বেশিই হওয়ার কথা। তাহলে ওই সময় পিকেটি যে নিম্নতর ক্যাপিটাল-ইনকাম অনুপাতের পরিমাপ দেখাচ্ছে তা সত্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৪। ক্যাপিটালের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মাপা সম্ভব নয়, কারণ অন্য সব উপাদান কখনোই স্থির রাখা সম্ভব নয়।

৫। পিকেটির আলোচনায় সঞ্চয় হার নিয়ে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ। সঞ্চয় যদি বিনিয়োগে পরিণত হতে না পারে তাহলে চাহিদার অভাবে মন্দা সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের মন্দা অবস্থায় রাষ্ট্র কেনসীয় পলিসি গ্রহণ করতে পারে, উপনিবেশে বিনিয়োগ অভিযান চালাতে পারে। প্রাক্-পুঁজিবাদী খাতগুলোতে দখল অভিযানও চালাতে পারে অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটি সাম্রাজ্যবাদী প্রতিব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা থাকতে পারে। পিকেটি এই দিকটা সম্পর্কে একদম নীরব থেকে গেছেন।

৬। পিকেটি নিজেই দাবি করেছেন যে অতি উচ্চ পদের টেকনোক্র্যাট কাম এন্টারপ্রেনাররা নিজেদের বেতন নিজেই নির্ধারণ করে থাকেন। এটা যদি সত্য হয় তাহলে শ্রমের প্রাপ্তিহার নিছক প্রান্তিক দক্ষতা তত্ত্ব দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৭। বর্তমান দুনিয়ায় শ্রমের গতিশীলতা না থাকলেও পুঁজির গতিশীলতা বিদ্যমান। এই অবস্থায় পিকেটির মডেলে যে অতিরিক্ত পুঁজির বিপদের কথা বলা হয়েছে তা নাও বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ, উদ্বৃত্ত পুঁজি পশ্চাৎপদ এলাকায় গিয়ে r কে বাড়িয়ে তুলতে পারবে এবং মূল্য সংযোজনে পুঁজির প্রাপ্ত অংশও বাড়াতে পারবে। নিজের কেন্দ্রে কম হলেও তার অসুবিধা নাও থাকতে পারে।

এই সমালোচনাগুলো মূলত পিকেটির নয়া ধ্রুপদি অর্থনৈতিক পদ্ধতির সমালোচনা। তবে পট্টনায়েক আরেকটি মৌলিক সমালোচনা করেছেন, সেটি হচ্ছে পিকেটির 'গ্লোবাল ট্যাক্স' প্রস্তাবের সমালোচনা। এ ধরনের সংস্কার করার সক্ষমতা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর কখনোই হবে না বলে তিনি মনে করেন। আর কখনো যদি কোনো রাষ্ট্রের চরিত্র এতখানি বদলে যায় যে তারা এই সংস্কারটি করতে পারবে, তাহলে তো তারা বিপ্লবই করে ফেলবে, এটাই পট্টনায়েকের বিশ্বাস। পট্টনায়েক মাইকেল কালেকি কর্তৃক উদ্ধৃত জোয়ান রবিনসনের যে উদ্ধৃতিটি এখানে ব্যবহার করেছেন সেটি উল্লেখ করে পট্টনায়েকের আলোচনাটির সমাপ্তি টানছি :

'Any government which had the power and the will to remedy the major defects of the capitalist system would have the will and power to abolish it altogether, while the governments which have the power to retain the system lack the will to remedy the defects.' [Joan Robinson, 1936]

বিশ্ববিখ্যাত ধনী মাইক্রোসফটের জনক বিল গেটস ১৩ই অক্টোবর ২০১৪ সালে পিকেটির বইটির ওপর আরেকটি পর্যালোচনা তাঁর ব্লগে প্রকাশ করেন। সেটি দক্ষিণ দিক থেকে পিকেটির একটি সমালোচনা। সেখানে তিনি বলেন :

১। পিকেটির বইটি লেখার আগে স্কাইপে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এবং পরে আমি বইটি পড়েছি এবং আমার মতে সবারই তা পড়া উচিত। কারণ পুঁজির অসুখ এবং তার প্রতিষেধক দুইয়েরই সন্ধান মিলবে এই বইয়ে।

২। পিকেটির যে অনুসিদ্ধান্তগুলো আমি সঠিক বলে মনে করি সেগুলো হচ্ছে :

'High levels of inequality are a problem-messing up economic incentives, tilting democracies in favours of powerful interests and undercutting the ideal that all people are created equal.'

Capitalism does not self correct toward greater equality-that is excess wealth concentration can have a snowballing tendencies if and when they choose to do so.'

৩। পিকেটির যে অনুসিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত নই তা হচ্ছে

'To be clear when I say that levels of inequality are a problem, I do not want to imply that the world is getting worse.'

৪। বিল গেটস পরে বলতে চেয়েছেন যেসব পুঁজিপতি একরকম নয়, তার বিশ্বাস ও প্রদত্ত উদাহরণে তিনি তিন রকম পুঁজিপতির অস্তিত্বের কথা বলেন : একজন হচ্ছেন উদ্যোক্তা পুঁজিপতি যিনি পুঁজিকে উৎপাদনশীল নতুন কাজে ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করেন, ব্যবস্থাপনা, শ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, উদ্বৃত্ত তৈরি ও আয় করেন, অন্য একজন পুঁজিপতি এত বেশি উদ্বৃত্তের অধিকারী যিনি উদারভাবে তা মানবহিতৈষী কর্মে ব্যয় করেন এবং তৃতীয় আরেকজন পুঁজিপতি হয়তো একটি বিলাসবহুল দ্বীপ বা জাহাজ কিনে টাকা উড়িয়ে দিচ্ছেন। বিল গেটসের মতে, পিকেটির ট্যাক্স প্রস্তাব প্রথম দুই ধরনের পুঁজিপতিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে তৃতীয় ধরনের অতিরিক্ত ভোগী অথবা এবং খাজনাভোগী পুঁজিপতিদের ট্যাক্সের আওতায় আনার সুপারিশ করেছেন গেটস।

পিকেটির উল্লিখিত সমালোচনাগুলো একজন দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থসচেতন পুঁজিপতির সমালোচনা। এটা প্রমাণ করে যে পুঁজিপতিদের মধ্যেও পৃথকায়ন ও ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম সম্ভব। পিকেটির গ্রন্থের মাধ্যমে আজ এটা প্রমাণিত হলো যে পুঁজিবাদের প্রতিনিধিরাই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে পুঁজিবাদের একটি কঠিন অসুখ রয়েছে। এই অসুখ সারানোর নিজস্ব ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এই অসুখের একটি পোশাকি নামও তাঁরা দিয়েছেন 'Inequality Trap' বা 'বৈষম্যের ফাঁদ'। বিশ্বব্যাঙ্কও এখন এই শব্দটি তাদের লিটারেচারে ব্যবহার করছেন। এই ফাঁদে ধরা পড়লে একটি দেশের বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো নিজেই নিজেকে নিরন্তর শক্তিশালী করতে থাকে এবং তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশ আজ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো দেশের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১০২৬ থেকে ১২৪৭৫ ডলারের মধ্যে থাকলে তাকে মধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। তবে ১০২৬-৪০৩৫ ডলার পর্যন্ত যাদের মাথাপিছু আয় তাদের নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। বাংলাদেশ এই নিম্ন মধ্য আয়ের নিম্ন প্রান্তে আজ অবস্থিত। চীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা এই দেশগুলো মাথাপিছু ৫০০০ ডলারের ওপরে আয় নিয়ে বর্তমানে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে কিন্তু তারা এখন Inequality Trap এ আটকে যেতে বসেছে। যদি তারা তাদের উচ্চ বৈষম্য কমাতে না পারে তাহলে তারা আর মধ্য আয়ের দেশ থেকে বেড়ে উচ্চ আয়ের দেশে কখনোই পৌঁছাতে পারবে না। এসব দেশের উচ্চ আয়বৈষম্য তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে :

ক। প্রথমত: বড় ধনিকদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের কারণে পুঁজিবাদের প্রধান যে ইতিবাচক শক্তি ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ তা তারা এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

খ। গণতন্ত্র অর্থনৈতিক চাপের মুখে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ব্যাপক জনমতের সঙ্গে নিয়ত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হচ্ছে এবং বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পুঁজি অনেক সময় অন্য দেশে পালিয়েও যাচ্ছে।

গ। বৈষম্যমূলক অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ চাহিদা সর্বদাই সংকুচিত থাকে এবং বাধ্য হয়ে তখন বাইরে শ্রমঘন রপ্তানি বা শ্রম শক্তি রপ্তানির দিকে মনোযোগ দিতে হয়। কিন্তু মধ্য আয়ের দেশ যখন নিম্ন প্রান্তে থাকে তখন এটা চললেও উচ্চ প্রান্তে এগোতে হলে ব্যাপক জনগণের দেশীয় ক্রয়ক্ষমতা, দক্ষতা বাড়িয়ে এবং তাদের আয় বাড়িয়ে দেশের ভেতরের বাজারকে বাড়াতেই হবে। তা না পারলে মধ্য আয়ের নিম্ন প্রান্তেই পড়ে থাকতে হবে বাংলাদেশকে।

মধ্য আয়ের যে দেশগুলো এই ফাঁদে পড়েনি তারা হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, জাপান

ইত্যাদি ইস্ট এশিয়ান দেশগুলো। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এরা পুঁজিবাদী দেশ হলেও এর অর্থনৈতিক-সামাজিক বৈষম্য সাফল্যের সঙ্গে কমিয়ে রাখতে পেরেছিল। তার সামাজিক রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নাকচ করে বাজার ও ব্যক্তিমালিকানাকে চরম বিশ্বাসে পরিণত করেনি। সুতরাং আমরা পিকেটির কথাই বলি আর মার্কসের কথাই বলি আমাদের যেভাবে হোক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আজ একটি সমতা অভিমুখী উন্নয়ননীতি গ্রহণ করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

মার্কস-এঙ্গেলস (১৯৭৫-এ), Selected Correspondence, Progress Publishers, Moscow, Letter to Conrad Schmidt from Engels on October 27, 1890; P-402.

মার্কস-এঙ্গেলস (১৯৭৫-বি), Selected Correspondence, Progress Publishers, Moscow, Letter to Conrad Schmidt from Engels on August 5, 1890, P-393.

লেনিন (১৯১৪), 'কার্ল মার্কস', গ্রানাত বিশ্বকোষের জন্য লিখিত প্রবন্ধ।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (অনুবাদ), (১৯৭৬) 'মার্কস-এঙ্গেলস স্মৃতি', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো। পৃঃ ২৫৬-২৫৭

মার্কস-এঙ্গেলস (১৮৮৮), কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃঃ ৫৫-৫৬

মার্কস-এঙ্গেলস (১৯৮৯) কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম-২৪, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃঃ ৮১-৯৯

এম এম আকাশ (১৯৯৬), 'নতুন সন্ধিক্ষণে বামপন্থীরা কি করবেন?', পৃঃ-৪৪-৪৮, শিখা অনির্বাণ, এপ্রিল, ১৯৯৬, সংখ্যা-১, চট্টগ্রাম।

বালজাক অনরি ডি (১৮৩৫), ফাদার গরিয়ট, নিউইয়র্ক, ডব্লিউ-ডব্লিউ নরটন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮।

রবার্ট এলেন (২০০৯), 'Engel's Pause : A pessimist's guide to the British Industrial Revolution', Exploration in Economic History, 46, no. 4 October, 2009-418-35

পল ক্রুগম্যান (২০১৪), 'Why we are in a new gilded stage', http://mybooks.com/articals/archives/2014/may/08.

জোয়ান রবিনসন (১৯৩৬), 'Review of R. F. Harrod's book the Trade Cycle', The Economic. Journal, December 1936.

নজরুল ইসলাম (২০১৪), 'Will Inequality lead China to Middle Income Trap?' Frontiers of Economics in China, 9(3), PP:378-437.

Thomas Piketty, (2014) Capital in the Twentyfirst Century, Harvard University Press, USA.

জনসংখ্যা তত্ত্বের গৈরিকীকরণ

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনসংখ্যা-তত্ত্বের গৈরিকীকরণ (Saffromisation of Demography) সংঘ পরিবার ও হিন্দু দক্ষিণপন্থী হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। সংঘ পরিবার সবসময়েই প্রচার করে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার গতিময়তা (Dynamics) গুণগতভাবে পৃথক। তারা ধারাবাহিক প্রচারের মাধ্যমে এই তত্ত্বটিকে কমন উইসডম বা কমনসেন্সের স্তরে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। গৈরিক জনসংখ্যাতত্ত্বের (Saffrom Demography) প্রধান দুটি আলোচ্য বিষয় হলো : প্রথমত, বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধর্মের জন্মহার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি। গৈরিক জনসংখ্যাতত্ত্বের সম্পর্কে কিন্তু অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপেক্ষিত থেকে যায় : (১) বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের মৃত্যুহারের পার্থক্য, (২) পরিযায়িতার (Migration) প্রসঙ্গে শুধু বেআইনিভাবে অন্য দেশ থেকে দেশের ভিতরের পরিযায়িতার বিষয়টিকে সামনে আনা হয়, কিন্তু দেশের ভিতরে ও দেশ থেকে বাইরের পরিযায়িতাকে আড়ালে রাখা হয়। ইসলামোফোবিক অবস্থানকে শক্তিশালী, বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য মুসলিম-জন্মহার বিষয়ে একধরনের বদ্ধ-সংস্কার (obsession) জাগিয়ে তোলা হয়। তারফলে ভারতে জনসংখ্যাতত্ত্বের আলোচনায় অত্যন্ত জীবন্ত অনেক সমস্যা তাদের আলোচনার বাইরে থেকে যায় : যেমন : (১) শিশু-কন্যার বিবাহ, (২) কন্যাভ্রূণ হত্যা, (৩) শিশুদের লিঙ্গ অনুপাত, (৪) এইডস-এর বিস্তারের প্রভাব ইত্যাদি।

এক

সংঘ পরিবারের সংগঠনগুলি ও গৈরিক জনসংখ্যা-তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট বা আদমশুমারি থেকে বাছাই করা নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণ নাগরিকদের কমন সেন্সের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দুরা ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। তাই আমরা আমাদের আলোচনা সূচনাতেই 'কমন সেন্স' বিষয়ে আন্তোনিও গ্রামশির তত্ত্বভাবনার প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করে নেব। গ্রামশি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে 'কমন সেন্স'-এর প্রসঙ্গটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। একটি দর্শনের সাহায্যে অন্য একটি দর্শণের বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই দার্শনিক স্তরে গুণগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। শুধুমাত্র কিছু আইডিয়া বা ধারণার বিরোধিতাই যথেষ্ট নয়। সেইসঙ্গে যেসব সামাজিক শক্তিসমূহ ঐসব ধারণাগুলির পিছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে, ঐসব সামাজিক শক্তিগুলি যে মতাদর্শগত কাঠামো নির্মাণ করেছে তাদের বিরোধিতা করাও অত্যন্ত জরুরি। ঐসব ধারণা ও মতাদর্শ সামগ্রিকভাবে মিলেমিশে, 'কমনসেন্স' নির্মাণ করে তোলে। একটি নির্দিষ্ট যুগে বিশ্বকে দেখার

ক্ষেত্রে অসমালোচনামূলকভাবে ও অসচেতনভাবে 'সাধারণ' অনেক ধারণা ও আদর্শকে আত্তীকৃত করে নেবার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। তাই একটি বিকল্প দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে 'কমনসেন্সের' সমালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। বৃহত্তর মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে 'কমনসেন্সের' সমালোচনা একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিসর।

সব মানুষই অসচেতনভাবে ও তার নিজের মতো করে একজন দার্শনিক। প্রথম স্তরে, কোনোরকম বৌদ্ধিক সক্রিয়তা ছাড়াই সব মানুষই বিশ্ব সম্পর্কে এক ধরনের নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে নেয়। দ্বিতীয় স্তরে তার মধ্যে একধরনের সচেতনতা ও সমালোচনামূলক মানসিকতা নির্মিত হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষ সচেতনভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হবার সময় থেকেই যে যান্ত্রিকভাবে কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। তাদের প্রভাবের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অসচেতন ও অসমালোচনামূলকভাবে 'চিন্তা' করতে শুরু করে। যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে, কোনোরকম বৌদ্ধিক সক্রিয়তাকে বাদ দিয়েই, মেনে নিতে শুরু করে। দ্বিতীয় স্তরে, সে নিজেই নিজের ধারণাগুলি সম্পর্কে সচেতনভাবে সমালোচনা করতে শুরু করে। নিজের মস্তিষ্কের শ্রম-ক্রিয়তার মাধ্যমে সে নিজের সক্রিয়তার পরিসরকে নির্বাচন করে নেয় ও বিশ্ব ইতিহাসকে নতুনভাবে নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ শুরু করে। নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে বহির্বিশ্বকে আত্তীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। তখনই তার প্রয়োজন হয় একটি আসঞ্জিত বিশ্ববীক্ষা, সুসংগঠিত দার্শনিক ও বৌদ্ধিক শৃঙ্খলা–যা ধর্ম বা কমনসেন্স তাকে দিতে পারে না। আবার ধর্ম ও কমন সেন্স পুরোপুরি একরকম হতে পারে না। ধর্ম হচ্ছে খণ্ডায়িত কমনসেন্সের একটি উপাদান। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার : কমনসেন্স হচ্ছে একটি সমষ্টিবাচক (Collective noun) বিশেষ্য। ধর্মের মতো এখানেও শুধু এক ধরনের কমনসেন্স নেই। যদিও ধর্ম ও কমনসেন্স উভয়েই ইতিহাসের পরিণতি ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। একটি সুশৃঙ্খল দার্শনিক ভাবনা বা বিশ্ববীক্ষা ধর্ম ও কমনসেন্সকে অতিক্রম করে যেতে পারে।

ধর্ম ও কমনসেন্স কোনো বৌদ্ধিক শৃঙ্খলার জন্ম দিতে পারে না। কারণ, তারা ব্যক্তি মানুষের চেতনার স্তরে বা যৌথ সামাজিক চেতনার স্তরে কোনো বীক্ষাগত আসঞ্জন (Coherence) ও সমগ্রতার (Unity) সূচনা ঘটাতে পারে না। তারা অথরেটেরিয়ান অবস্থান থেকে অতীত ও বর্তমান থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের যথাপ্রাপ্ত চিন্তা ও বাস্তবকে অসমালোচনামূলকভাবে মেনে নিতে বাধ্য করে। এই অভ্যাসের মধ্যে থাকতে থাকতে কমনসেন্স হয়ে ওঠে অদার্শনিক-দের দর্শন (Philosophy of non-philosophers) বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষদের চেতনায়, গড়পড়তা সাধারণ নাগরিকদের নৈতিক ধারণাসমূহ নির্মিত ও বিকশিত হয়ে ওঠে। অসমালোচনামূলকভাবে আত্তীকৃত বিভিন্ন কমনসেন্সের ওপর নির্ভর করে। একটি সময় ও পরিসরে কমনসেন্স কোনো সমসত্ত্বধর্মী, অনুপম ধারণা নয়। কমনসেন্স দর্শনের 'ফোকলোর' বা 'লোকাচারবিদ্যা'। লোকাচার বিদ্যার মতো কমন সেন্সও বিভিন্ন-অগুন্তি প্রকরণ গ্রহণ করে। কমনসেন্সের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো : এটা এমন একটা ধারণা যা অবশ্যই খণ্ডায়িত, অ-আসঞ্জিত ও কার্যকারণ সম্পর্কহীন। কমনসেন্স যে জনগোষ্ঠীর দর্শন সেই জনগোষ্ঠীর কাছে তা মান্যতা পেয়ে যায়। আবার ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মেই একটি সমসত্ত্বধর্মী সামাজিক গোষ্ঠী সামনে এসে যায়. যারা কমন সেন্সের বিরোধিতা শুরু করে, যাদের একটি সুশৃংখল ও আসঞ্জিত দর্শন থাকে। 'অ-দার্শনিকদের দর্শন'-কে, দর্শনের ফোকলোরকে, খুব সহজেই একটি উন্নত মেধা-বুদ্ধি-সংস্কৃতিসঞ্জাত সুশৃংখল-আসঞ্জিত দর্শনের সাহায্যে প্রতিস্থাপিত করা যাবে–এমন সরল ভাবনা কিন্তু যথার্থ নয়। সাধারণ নাগরিকদের চেতনায় অতীত প্রজন্মের স্মৃতিগুলি দুঃস্বপ্নের

মতো ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সুশৃংখল-আসঞ্জিত দার্শনিক ধারণাগুলির সাধারণ নাগরকিদের চেতনায় কোনো প্রভাব নেই। বাইরের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তার প্রভাব অবশ্যই আছে। সাধারণ নাগরিকদের রাজনৈতিক চিন্তার ধারাবাহিক অন্তর্গত রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে কমনসেন্সের বিরুদ্ধে; একটি যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ, আসঞ্জিত একটি বিকল্প মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, সময়সাপেক্ষ, গভীর তত্ত্ব-কর্মচর্চানির্ভর প্রক্রিয়া। কমনসেন্স সবসময়েই খুব স্থূল বোধশক্তির প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তা প্রবলভাবে 'রিয়ালিস্টিক' বা বাস্তবতাবাদী ও 'মেটিরিয়ালিস্টিক' বা জড়বাদী আড়ালের পিছনে থাকে বলে চট করে তাকে কুসংস্কারমূলক বা অসমালোচনামূলকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই সমালোচনা-পদ্ধতি হিসেবে আলোচনার শুরুতেই সুসংগঠিত দার্শনিক সমালোচনা না করে কমন সেন্সের সমালোচনা কিছুদূর পর্যন্ত করা উচিত। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, বুদ্ধিদীপ্ত সংগঠিত দার্শনিক আলোচনাকে কম গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে। যখনই একজন ব্যক্তিমানুষ বা গোষ্ঠী কমনসেন্স-এর সমালোচনা করতে করতে, তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে, তখনই সে এই সংগঠিত দর্শনকে গ্রহণ করতে পারে। (সূত্র : Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, Edited and translated by quintin Hoare and geoffres Nowell Smith, Orient Blackswan, 2009, pp.323-333, 419-425)

দুই

সংঘ পরিবারের লোকজনরা জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যবিষয়ে গভীর আলোচনার বদলে এক প্রবল উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। 'হিন্দু জনসংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে', 'মুসলিম জনসংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে', 'ভারতে হিন্দুরা কিছুদিনের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে' ইত্যাদি ভাবনা অসমালোচনামূলকভাবে বহু মানুষের চেতনায় আত্তীকৃত হয়ে যাচ্ছে সংঘ পরিবারের ধারাবাহিক সুসংগঠিত প্রচারের ফলে ও সেই সঙ্গে গণমাধ্যমের এক অংশের দায়িতজ্ঞানহীন ভূমিকার পরিণতিতে। দক্ষিণপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলি মনে করে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের সমানুপাতিক।

২০০৩ সালের জুলাই মাসে এ পি যোশি, এম ডি শ্রীনিবাস এবং জে কে বাজাজ লিখিত 'রিলিজিয়াস ডেমোগ্রাফি অব ইন্ডিয়া' বইটি চেন্নাই-এর সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন এল কে আদবানি। প্রকাশনায় সহায়তা দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ। বইটির প্রধান মেসেজ ছিল : 'the proportion of Indian Religionists Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Jews in India is likely to fall below 50 percent early in the latter half of the twenty-first century' (Joshi et al, ibid, xix)। এই বক্তব্যটি কমনসেন্স হিসেবে অসমালোচনামূলকভাবে গৃহীত হলে জনসংখ্যা তত্ত্বের গৈরিকীকরণের প্রক্রিয়া মান্যতা পেয়ে যায়। কিন্তু সমালোচনামূলকভাবে দেখলে, প্রথমেই মনে হয় 'Indian Religionists' শব্দবন্ধটি একটি অ-আসঞ্জিত (incoherent) পরিভাষা। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রিলিজিয়নিস্টদের মধ্যে মুসলমান ও ক্রিশ্চিয়ানরা নেই। অর্থাৎ ভারতীয় জনগণ থেকে তাদের পৃথক করে, অসমসত্ত্বধর্মী করে, দেখানোটাই উদ্দেশ্য। ২০০১ ও ২০১১-এর আদমশুমারি অনুসারে মুসলমান ও ক্রিশ্চিয়ানদের মিলিত শতাংশের হিসেব যথাক্রমে ১৫.৪৭% ও ১৬.৫৩%। এই বইটিতে যে স্ট্যাটিসটিক্যাল রিগ্রেসন টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছে তা তাদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উলটোদিকে দেখা গেছে প্রত্যেক ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর

মধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান। হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি হারের তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সারণি-১

বিষয় : হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার (%)

ধর্ম	১৯৮১-১৯৯১	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১
হিন্দু	২৩%	২০%	১৬.৮%
মুসলিম	৩৩%	২৯%	২৪.৬%

সংঘ পরিবার রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য এতই বেশি যে, তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বা বোঝাপড়া অসম্ভব। বহু মানুষের মধ্যে কমনসেন্সের স্তরে এই অসম্ভাব্যতার বিষয়টি বাস্তবে অস্তিত্ববান। ইসমামোফোবিক ধারণাগুলিকে সংঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখাগুলি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। গোঁড়া হিন্দু রাজনীতির লোকেরা সব সময়েই এই বিশ্বাসকে চারিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যে, মুসলমানরা দেশবিরোধ, ভারতবিরোধী শক্তি ও মুসলমান নারীরাই তাদের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য। তারা একটি বৃহত্তর হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলতে চাইছে। কিন্তু বাস্তবে শ্রেণি, জাতাপাত, পেশা ও লিঙ্গ-ভিত্তিক যেসব বহুত্ব ও সংঘাত বিদ্যমান সেগুলিকে তারা অস্বীকার করছে। তার ফলে হিন্দু ঐক্যের ধারণা শুধুমাত্র কমনসেন্সের স্তরেই গৃহীত হতে পারে। কোনো আসঞ্জিত ও সংগঠিত বিশ্ববীক্ষার ওপর বৃহত্তর হিন্দু ঐক্যের ধারণা দাঁড়িয়ে নেই। তার ফলে গৈরিক জনসংখ্যাতত্ত্বকেও বহু তথ্যকে আড়াল করতে হয়। শুধুমাত্র কিছু বানিয়ে তোলা, জাগিয়ে তোলা, বাড়িয়ে তোলা অসমালোচনামূলকভাবে গৃহীত কমনসেন্সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যকেই সামনে আনা হয়, লালন করা হয়।

দেশভাগের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হয়। পাকিস্তানী গুপ্তচর ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই দেশের ভিতরে সব ধরনের ছোট বড় সমস্যাগুলিকে বানিয়ে তুলছে। সব থেকে বড় বিপদ মুসলিম নারীদের জন্মহার। তার ফলে দেশে মুসলিম জনসংখ্যা এমন স্তরে পৌঁছবে যে, পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে মুসলিমরা তাদের পাশে দাঁড়াবে ও পাকিস্তান ভারত জয় করে নেবে। সংঘ পরিবারের সবকটি শাখা এই ধরনের যুক্তিহীন, তথ্য বর্জিত, অ-আসঞ্জিত, অসমালোচনামূলকভাবে গৃহীত বক্তব্যগুলিকে কমনসেন্সের স্তরে তুলে নিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তার জন্য তারা প্রয়োজনমতো জনসংখ্যাতত্ত্বের গৈরিকীকরণ ঘটাচ্ছে। মুসলিমরা সব সময়ে জাতিবিরোধী। কংগ্রেস 'মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের' স্বার্থে তাদের প্রশ্রয় দিয়েছে। পরিণতিতে মুসলিমরা 'এন ব্লক', আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরের নির্বাচনগুলিতে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ কংগ্রেসকে ভোট দিলেও তা কখনই সমসত্তধর্মী ছিল না। মুসলিম ভোট সব সময়েই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। যে অঞ্চলে যে দল দরিদ্র মানুষদের স্বার্থে কাজ করেছে, সেই অঞ্চলে মুসলিমদের বড় অংশ তাদের ভোট দিয়েছে। সেই কারণে 'মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক' বিষয়ক ভাবনা একটি কমনসেন্স মাত্র। যদিও জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী এই ভাবনাটি কমনসেন্সের মতো বহু মানুষের চেতনায় আত্তীকৃত হয়ে রয়েছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা কোনো এক ধর্মীয় কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পেয়ে 'এন ব্লক' ভোট দেয় – এটা মেনে নেওয়া মানে, দেশের সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ থেকে আলাদাভাবে অবস্থান করছে – এটাও মেনে নেওয়া। এই মেনে নেওয়াটা অবশ্যই জাতীয় ঐক্যের ভাবনার পরিপন্থী।

সংঘ পরিবার রামচন্দ্রকে দেশের হিন্দু পুরুষদের সামনে আদর্শ পুরুষ হিসেবে, 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' হিসেবে হাজির করে। তারা রামকে যেকোনো আক্রমণের মুখে অটল, সংশয়হীন, দৃঢ়চেতা যোদ্ধা হিসেবে দেখাতে চায়। রাম হচ্ছে আক্রমণাত্মক পুরুষ এবং তার সামনে সব সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসীদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে। অন্যদিকে হিন্দু নারীদের চিহ্নিত করা হয় জাতির মা হিসেবে, যারা হবেন বিশুদ্ধ দেশপ্রেমিক হিন্দু নাগরিক, যারা রামের জন্মস্থানকে আক্রান্ত সন্তানের মতো রক্ষা করবেন। মুসলিম পুরুষদের রক্ত গরম, তারা দাঙ্গা বাধায় ও দাঙ্গার সময়ে ভয়ংকর হিংস্র আক্রমণ চালায়। হিন্দুদের দ্বারা উত্তেজনা ছড়ানো, আক্রমণ করা ও রাষ্ট্র কর্তৃক হিন্দুদের রক্ষা করার বিষয়ে সংঘ পরিবার স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চুপ থাকে। তাদের মতে, মুসলিম নারীরা পুরুষদের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে নিপীড়িত হয়। কমনসেন্সের স্তরে একথা খুব সহজেই মান্যতা পেয়ে যায়, কারণ মুসলিম পুরুষরা 'তালাক' দিতে পারে। মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনযাপন প্রবলভাবে ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মুসলিম নারীরা অন্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের নারীদের তুলনায় বেশি সন্তানের জন্ম দেয়। কারণ মুসলিম নারীরা অনেক বেশি পশ্চাৎপদ, প্রবলভাবে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও কঠোরভাবে পুরুষ নির্দেশিত। মুসলিম পুরুষরা হিন্দু পুরুষদের তুলনায় বেশি সন্তানের জন্ম দেয় – তার কারণ তাদের একাধিক বিয়ে, সহজেই তালাক দিতে পারে, ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশ তারা নির্দ্বিধায় মান্য করে। মুসলিম ধর্মীয় নেতারা হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য পুরুষদের দিয়ে বেশি করে সন্তান উৎপাদন করায়। সংঘ পরিবারের বক্তব্য অনুসারে, পর্দা প্রথা, বহু বিবাহ, শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা, নারীদের পিছিয়ে রাখা ও ক্ষমতা দখলের এজেন্ডা, সব মিলিয়ে মুসলিমদের বেশি জন্মহারের বিষয়টিকে 'ব্যাখ্যা' করা যায়। এইভাবে কমনসেন্সের সাহায্যে সংঘ পরিবার সব সময়েই প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, হিন্দু ও মুসলিমরা সত্তাগতভাবেই পৃথক ও ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে মুসলিমরা সব সময়েই স্থায়ী আতঙ্ক।

তিন

আমরা আগেই দেখেছি, ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতবর্ষে জন্মহার কমছে। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে জন্মহার কম হলে যে স্বাস্থ্যের দিক থেকে, পারিবারিক ও আর্থিক দিক থেকে অনেক সুবিধা সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণপন্থী হিন্দুদের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালানো হয় যে, মুসলিমরা ধর্মীয় কারণে কনট্রাসেপটিভ ব্যবহার করে না ও স্টেরিলাইজেনস পদ্ধতির আশ্রয় নেয় না। এ আর ওমরানের মতে, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিরোধক ব্যবহারের বিষয়ে ইসলামিক টেক্সটে স্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। আবার কোনো কোনো সূত্রে বলা আছে coitus interruptus (coitus that is Intentionally interrupted by withdrawal before ejaculation) -কে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে এবং সেই সঙ্গে সবধরনের নন-টারমিনাল পরিবার পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে। অন্তঃসত্ত্বা হবার তিনমাস পরে 'ensoulment' (endowment with a soul বা আত্মা) হয়। কোনো কোনো থিওলজিস্ট-এর মতে, 'ensoulment'-এর আগে গর্ভপাত সমর্থনযোগ্য। অনেক থিওলজিস্ট-এর মতে, মায়ের স্বাস্থ্যের স্বার্থে, গুরুতর সংক্রমণকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে, নৈতিকভাবে বন্ধ্যাত্বকরণ গ্রহণযোগ্য। (A.R. Omran, Family Planning in the Legacy of Islam, Routledge, 1992) ১৯৭০-এর দশক থেকে বাংলাদেশে Total Fertility Rate বা TFR কমছে, তার প্রধান কারণ জন্মনিরোধক ব্যবহারের বৃদ্ধি। ইরান সমেত অনেকগুলি মুসলিম প্রধান দেশে বন্ধ্যাত্বকরণের সাহায্য না নেওয়ায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৭৯-এর 'বিপ্লবের' পরে ইরানে বন্ধ্যাত্বকরণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৯-এর পরে তা আবার শুরু হয়েছে। (C.M. Obermeyer, Religious Doctrine, State Ideology and Reproductive Options in Islam, pp 59-75 in Power and Decision : The Social Control of Reproduction (Eds.) G. Sen and R.C. Snow, Boston, Harvard School of Public Health, 1994) অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে হচ্ছে এমন সিদ্ধান্ত একধরনের কমনসেন্স মাত্র।

আমরা যদি Total Fertility Rate বা TFR-এর দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে TFR গোটা ভারতে ধারাবাহিকভাবে কমছে। TFR থেকে বোঝা যায় গোটা ভারতে জননক্ষম থাকা বছরগুলিতে প্রতি নারী পিছু কতগুলি শিশুর জন্ম হচ্ছে। মহিলা প্রতি সন্তান সংখ্যা ২.১ হলে তাকে বলা হয় রিপ্লেসমেন্ট অবস্থা। এই অবস্থায় পৌঁছালে মোট জনসংখ্যার আর পরিবর্তন ঘটে না। জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক স্তরে ২.১-কে বলা হয় রিপ্লেসমেন্ট অবস্থা। আমরা সারণি-২-এর দিকে তাকালে বুঝতে পারব কোন রাজ্যে (বড় রাজ্য) TFR কত ও তা রিপ্লেসমেন্ট অবস্থা থেকে কত দূরে বা কাছে। আবার এই সারণি থেকে এটাও বোঝা যাবে দশ বছরের তফাতে TFR হ্রাসের প্রবণতাকেও। (seccensusindia.govt.in)

সারণি-২

বিষয় : ২০০০-২০০২ ও ২০১০-১২'র মধ্যে গড় TRF পরিবর্তনের শতাংশের হিসেব (ভারত ও বড় রাজ্যগুলির)

ভারত ও বড় রাজ্য	মোট			গ্রাম			শহর		
	২০০০-০২	২০১০-১২	পরিবর্তন %	২০০০-০২	২০১০-১২	পরিবর্তন %	২০০০-০২	২০১০-১২	পরিবর্তন %
ভারত	৩.১	২.৪	– ২২.৬	৩.৪	২.৭	– ২০.৬	২.৩	১.৯	– ১৭.৪
অন্ধ্র প্রদেশ	২.৩	১.৮	– ২১.৭	২.৪	১.৯	– ২০.৮	২.০	১.৬	– ২০.০
আসাম	৩.০	২.৪	– ২০.০	৩.২	২.৬	– ১৮.৮	১.৮	১.৫	– ১৬.৭
বিহার*	৪.৪	৩.৪	– ২২.৭	৪.৬	৩.৬	– ২১.৭	৩.২	২.৪	– ২৫.০
গুজরাট	২.৯	২.৫	– ১৩.৮	৩.২	২.৭	– ১৫.৬	২.৩	২.০	– ১৩.০
হরিয়ানা	৩.১	২.৩	– ২৫.৮	৩.৩	২.৪	– ২৭.৩	২.৫	২.০	– ২০.০
হিমাচল প্রদেশ	২.২	১.৮	– ১৮.২	২.২	১.৮	– ১৮.২	১.৮	১.৩	–২৭.৮
কর্ণাটক	২.৪	১.৯	– ২০.৮	২.৬	২.১	– ১৯.২	১.৯	১.৭	– ১০.৫
কেরালা	১.৮	১.৮	০০	১.৮	১.৮	০০	১.৮	১.৮	০০
মধ্য প্রদেশ*	৩.৯	৩.১	– ২০.৫	৪.৩	৩.৩	– ২৩.৩	২.৫	২.১	– ১৬.০
মহারাষ্ট্র	২.৪	১.৮	– ২৫.০	২.৬	২.০	– ২৩.১	২.২	১.৬	– ২৭.৩
ওড়িশা	২.৭	২.২–	– ১৮.৫	২.৮	২.৩	– ১৭.৯	২.১	১.৫	– ২৮.৬
পাঞ্জাব	২.৪	১.৭	– ২৯.২	২.৫	১.৮	– ২৮.০	২.০	১.৭	– ১৫.০
রাজস্থান	৪.০	৩.০	– ২৫.০	৪.৩	৩.২	– ২৫.৬	২.৮	২.৪	– ১৪.৩
তামিলনাড়ু	২.০	১.৭	– ১৫.০	২.১	১.৭	– ১৯.০	১.৮	১.৭	– ৫.৬
উত্তর প্রদেশ*	৪.৬	৩.৩	– ২৮.৩	৪.৮	৩.৫	– ২৭.১	৩.৪	২.৬	– ২৩.৫
পশ্চিমবঙ্গ	২.৪	১.৭	– ২৯.২	২.৬	১.৯	– ২৬.৯	১.৬	১.৩	– ১৮.৮

* বিহার, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে যথাক্রমে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ডকে যুক্ত করা আছে।

পাশাপাশি আমরা যদি ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের TFR-এর তুলনা করি তাহলেও দেখা যায়, হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষ ও মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে TFR ক্রমাগত কমছে। (See www.indexmundi.com)

সারণি-৩

বিষয় : ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে TFR প্রবণতা (প্রতি নারী পিছু সন্তানের জন্মে)

দেশ	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
ভারতবর্ষ	৩.১১	৩.০৪	২.৯৮	২.৯১	২.৮৫	২.৭৮	২.৭৩	২.৮১	২.৭৬	২.৭২	২.৬৫	২.৬২	২.৫৮	২.৫৫	২.৫১
বাংলাদেশ	২.৮৫	২.৭৮	২.৭২	৩.১৭	৩.১৫	৩.১৩	৩.১১	৩.০৯	৩.০৮	২.৭৪	২.৬৫	২.৬০	২.৫৫	২.৫০	২.৪৫
পাকিস্তান	৪.৫৬	৪.৪১	৪.২৫	৪.১০	৪.২৯	৪.১৪	৪.০০	৩.৭১	৩.৭৩	৩.৬০	৩.২৪	৩.১৭	৩.০৭	২.৯৬	২.৪৬

আবার ইউনাইটেড নেশনস এর সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকেও দেখা যায় যে, ৪৬টি মুসলিম প্রধান দেশেও TFRক্রমহ্রাসমান। (see www.prb.org)

সারণি-৪

বিষয় : ৪৬টি মুসলিম প্রধান দেশের TFR-এর প্রবণতা

বছর	৭ বা তার বেশি	৬	৫	৪	৩	২ বা তার কম	মোট দেশ
১৯৬০-১৯৬৫	২৫	১৭	০৪	০০	০০	০০	৪৬
১৯৭৫-১৯৮০	১৯	১০	১১	০৫	০১	০০	৪৬
১৯৮০-১৯৮৫	১২	১৫	০৬	০৯	০৪	০০	৪৬
১৯৯৫-২০০০	০৪	০৮	০৮	০৩	১১	১২	৪৬
২০০৮	০১	০৭	০৩	০৮	০৬	২১	৪৬

চার

আমরা যদি উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকাই তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈপরীত্যের সন্ধান পাব। উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্য (উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থান) ও দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যের (অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরালা) বিভিন্ন মাপকাঠির তুলনামূলক তথ্য নিচের সারণিগুলিতে দেওয়া আছে। উত্তর ভারতের তিনটি নতুন রাজ্যে (উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়) মোট জনসংখ্যা খুবই কম (দেশের মোট জনসংখ্যার ৫.৬৭ শতাংশ)। ২০১১ সালে উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যের জনসংখ্যা দেশের ৪২.৪১ শতাংশ। দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১৭.৮৫ শতাংশ। ১৯৫১ সালে উত্তরের সাতটি রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৯.৬ শতাংশ এবং দক্ষিণের চারটি রাজ্যে ছিল ২৬.০৮ শতাংশ। (১৯৫১তে উত্তরের সাতটি রাজ্য আসলে ছিল চারটি রাজ্য। পরবর্তীকালে উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ বিভক্ত হয়েছে।) অর্থাৎ উত্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (৩৯.৬% থেকে ৪২.৪১), কিন্তু বিপরীতদিকে দক্ষিণে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে (২৬.০৮% থেকে ১৭.৮৫%)। (See Wikipedia.org) আমরা যদি উত্তরের রাজ্যগুলির গড় TFR-এর দিকে তাকাই (সারণি-৪ ও ৫) তাহলে দেখব তা ৩ থেকে ৩.৪-এর মধ্যে। অন্যদিকে দক্ষিণের ক্ষেত্রে তা ১.৭ থেকে ১.৯ এর মধ্যে। অর্থাৎ রিপ্লেসমেন্ট অবস্থার (২.১) থেকে কম। নারী ও পুরুষের অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে কতজন নারী) বা-দিক থেকেও দক্ষিণের চারটি রাজ্য অনেক এগিয়ে। (see Wikipedia.org ও sikhinstitute.org-তে গুরিন্দর কাউর ও দিভজোত কাউরের প্রবন্ধ।)

সারণি-৫

বিষয় : ১১টি রাজ্যের তুলনামূলক বিচার

রাজ্যের নাম	২০১১ সালের ভারতের জনসংখ্যার % হিসাবে	এক দশকের বৃদ্ধি (২০০১-১১) %	নারী পুরুষ অনুপাত	TFR (২০০০-২০০২) #	TFR (২০১০-২০১২)	TFR-এর পরিবর্তন %
উত্তর প্রদেশ	১৬.৪৯	২০.১০	৯০৮	৪.৬	৩.৩	– ২৮.৩০
উত্তরাখণ্ড	০.৮৪	১৯.২০	৯৬৩	*	*	*
বিহার	৮.৫৮	২৫.১০	৯১৬	৪.৪	৩.৪	– ২০.০০
ঝাড়খণ্ড	২.৭২	২২.৩০	৯৪৭	*	*	*
মধ্য প্রদেশ	৬.০০	২০.৩০	৯৩০	৩.৯	৩.১	– ২০.৫০
ছত্তিশগড়	২.১১	২২.৬০	৯৯১	*	*	*
রাজস্থান	৫.৬৭	২১.৪০	৯২৬	৪.০	৩.০	– ২৫
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪.০৮	১১.১০	৯৯৩	২.৩	১.৮	– ২১.৭০
কর্ণাটক	৫.০৫	১৫.৭০	৯৬৮	২.৪	১.৯	– ২০.৪০
তামিলনাড়ু	৫.৯৬	১৬.৬০	৯৯৫	২.০	১.৭	– ১৫.০০
কেরালা	২.৭৬	৪.৯০	১০৮৪	১.৮	১.৮	০০
ভারত	১০০	১৭.৬৪	৯৪০	৩.১	২.৪	– ২২.৬০

TRF = Total Fertility Rate, * বিহার, এম পি এবং ইউ পির হিসেব ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ডের মধ্যে ধরা আছে।

যদি ধর্মীয় কারণেই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয়, তাহলে উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যে TFR বেশি কেন, নারী-পুরুষের অনুপাতেই বা উত্তরের রাজ্যগুলি পিছিয়ে কেন? জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসের বিভিন্ন ধরনের শর্ত থাকে, সেগুলিকে সংঘ পরিবার বিবেচনার মধ্যে রাখে না।

আমরা যদি ২০০১ সালের হিসেব অনুসারে উক্ত ১১টি রাজ্যের হিন্দু ও মুসলিম সমাজের TFR-এর তুলনা করি তাহলেও দেখব দক্ষিণের চারটি রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে TFR কম, উত্তরের ৭টি রাজ্যের তুলনায়। (সারণি-৬)

সারণি-৬

বিষয় : ২০০১-এ ১১টি রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের TFR

রাজ্য	সব ধর্মের মধ্যে TFR	হিন্দুদের মধ্যে TFR	মুসলিমদের মধ্যে TFR
উত্তরাখণ্ড	৩.৬	২.৯	৫.১
রাজস্থান	৪.২	৪.১	৪.৮
উত্তর প্রদেশ	৪.৪	৪.১	৪.৮
বিহার	৪.৫	৪.৫	৫.১
ঝাড়খণ্ড	৪.১	৩.৮	৪.৯
ছত্তিশগড়	৩.৬	৩.৪	৩.০
মধ্য প্রদেশ	৩.৯	৩.৯	৩.৮
অন্ধ্র প্রদেশ	২.৩	২.৩	২.৮
কর্ণাটক	২.৪	২.৩	৩.২

কেরালা	১.৭	১.৫	২.৬
তামিলনাড়ু	১.৮	১.৮	২.১
ভারত	৩.২	৩.১	৪.১

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার ২০০৫-এর ২৯শে জানুয়ারি সংখ্যায় এস. ইরুদয়া রাজনের প্রবন্ধে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ২০০১ সালে গোটা দেশে গড় TFR ছিল ৩.২। উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল TFR ৫.১ থেকে ৩.০ এর মধ্যে। ছত্তিশগড় বাদে (৩.০) বাকি ৬টি রাজ্যে ৩.২-এর ও পরে। অন্যদিকে দক্ষিণের চারটি রাজ্যে ৩.২ থেকে ২.১। অর্থাৎ জাতীয় গড়ের সমান বা তার থেকে কম। শুধু ধর্মীয় কারণেই যদি মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে এই আঞ্চলিক বিভিন্নতা (Regional Variation) দেখা যায় কেন?

পাঁচ

সংঘ পরিবারের দীর্ঘদিনের অভিযোগ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা ধর্মীয় কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির আশ্রয় নেন না। মুম্বাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস-এর উষা রামের একটি প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে তাদের সমীক্ষা অনুসারে ১৯৯২-৯৩-তে বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতেন হিন্দুদের ১৬.১% ও মুসলমানদের ১৬.২%, ১৯৯৮-৯৯-এ হিন্দুদের মধ্যে ১৯.৬% ও মুসলিমদের মধ্যে ১৯.৫% এবং ২০০৫-০৬-এ হিন্দুদের মধ্যে ২৬.৯% ও মুসলিমদের মধ্যে ২৬.৬%। সারণি-৭ থেকে নির্বীজকরণ ও বিভিন্ন ধরনের Spacing method-এ হিন্দু ও মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। (seefpconference.org) Spacing method হল একটি সন্তানের জন্মের পর দ্বিতীয়বার সন্তান ধারণের মধ্যে কমপক্ষে ১৮ মাসের পার্থক্য রাখা। তার জন্য ডাক্তাররা বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারে কথা বলেন। আবার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় : নির্বীজকরণের প্রবণতা হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলিমদের মধ্যে কম। আবার অন্যদিকে আধুনিক স্পেসিং মেথড ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলিম

সারণি-৭

বিষয় : ১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০৫-০৬-এর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিবাহিত নারীদের মধ্যে (১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের) বিভিন্ন ধরনের কনট্রাসেপটিভ ব্যবহারের তথ্য।

ধর্ম/ সময়	অব্যবহার ও ব্যবহারের %				N	ব্যবহারের %			
	ব্যবহার করেন না	নির্বীজকরণ করেছেন	আধুনিক স্পেসিং মেথড ব্যবহার (কনডোম)	প্রথাগত স্পেসিং মেথড ব্যবহার		নির্বীজকরণ	আধুনিক স্পেসিং মেথড (কনডোম)	প্রথাগত স্পেসিং মেথড ব্যবহার	মোট
হিন্দু									
২০০৫-০৬	৭২.৯	১০.৭	৯.৮ (৪.৯)	৬.৪	১৯১৩২	৩৯.৮	৩৬.৪ (১৮.২)	২৩.৮	১০০
১৯৯৮-৯৯	৮০.২	১০.২	৫.৬ (২.৩)	৩.৮	১৯৮৪৮	৫২.০	২৮.৬ (১১.৭)	১৯.৪	১০০
১৯৯২-৯৩	৮৩.৯	৮.৩	৪.৮ (২.১)	৩.০	২১৭১০	৫১.৬	২৯.৮ (১৩.০)	১৮.৬	১০০

মুসলিম									
২০০৫-০৬	৭১:৪	৫.৭	১৩.৬ (৫.৬)	৯.৩	৩৪৯৬	১৯.৯	৪৭.৬ (১৯.৬)	৩২.৫	১০০
১৯৯৮-৯৯	৮০.৫	৪.৯	৮.৪ (৩.৩)	৬.২	৩৪০৭	২৫.১	৪৩.১ (১৬.৯)	৩১.৮	১০০
১৯৯২-৯৩	৮৩.৬	৪.৭	৫.৬ (২.১)	৫.৯২	৩৪৭৬	২৯.০	৩৪.৬ (১৩.০)	৩৬.৪	১০০
অন্যান্য ধর্ম *									
২০০৫-০৬	৬৭.৩	১৩.৭	১৩.৭ (৮.৫)	৫.২	৮৮১	৪২.০	৪২.০ (২৬.১)	১৬.০	১০০
১৯৯৮-৯৯	৭৩.১	৯.৫	১১.৯ (৫.৯)	৫.২	৯৭২	৩৫.৭	৪৪.৭ (২২.২)	১৯.৫	১০০
১৯৯২-৯৩	৮০.৪	৪.৯	১০.৬ (৪.৭)	৩.৯	১২০২	২৫.৩	৫৪.৬ (২৪.২)	২০.১	১০০

*অন্যান্য ধর্মের মধ্যে রয়েছে শিখ, খ্রীষ্টান

ও অন্যান্য ধর্মালম্বীরা হিন্দুদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি প্রথাগত স্পেসিং মেথড ব্যবহারের ক্ষেত্রও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমরা এগিয়ে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিভিন্নভাবে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৬. উষা রাম-এর গবেষণা থেকে এমন সিদ্ধান্তে অবশ্যই পৌঁছানো যায়।

ছয়

উত্তর ভারত ও পূর্ব ভারতের যে অংশগুলিতে মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার বেশি সেই অঞ্চলগুলিতে মুসলিম নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হারও কম। সারণি-৮ থেকে বোঝায় যায় হিন্দু ও মুসলিম নারীদের TFR ও সাক্ষরতার হারে পার্থক্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ২০০১ সালের হিসেব অনুসারে হরিয়ানায় সাক্ষরতার হার হিন্দু নারীদের মধ্যে ৫৭.১% ও মুসলিম নারীদের মধ্যে ২১.৫% (পার্থক্য ৩৫.৬%)। হরিয়ানাতে মুসলিম নারীদের TFR-এর পার্থক্য হিন্দু নারীদের তুলনায় তিন-এর বেশি। আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও পাঞ্জাবেও মুসলিম নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার হিন্দু নারীদের তুলনায় অনেক কম এবং TFR বেশি। পার্থক্য ২.৬ থেকে ১.২-এর মধ্যে। আবার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হারের পার্থক্য কম ও TFR -এর পার্থক্যও কম। তা থেকে বোঝা যায়, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার কমাতে হলে তাদের নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার বিস্তার, শিক্ষার বিস্তার, একটি অপরিহার্য শর্ত। ধর্মই যদি মুসলিম সমাজের , TFR বেশি হবার কারণ হতো তাহলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেই TFR কম তো না। কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের TFR -এর পার্থক্য ০.৩ থেকে ১.১-এর মধ্যে এবং হিন্দু ও মুসলিম নারীদের সাক্ষরতার হারের পার্থক্য ১.২ থেকে ৯.৯-এর মধ্যে। (See. EPN, January 2005, S Jrudaya Rajan)

সারণি-৮

বিষয় : ২০০১-এ বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের TFR ও নারী সাক্ষরতার পার্থক্যের তুলনা

রাজ্য	মুসলিম TFR- হিন্দু TFR	মুসলিম নারী সাক্ষরতার হার–হিন্দু নারী সাক্ষরতার হার
জম্মু ও কাশ্মীর	০.৫	-২৪.১
হিমাচল প্রদেশ	১.৫	–২১.১
পাঞ্জাব	১.২	-২৪.৯
উত্তরাখণ্ড	২.২	-২১,৪
হরিয়ানা	৩.২	-৩৫.৬
রাজস্থান	০.৭	-২.৪
উত্তর প্রদেশ	০.৭	-৫.৭
বিহার	০.৬	-১.৯
সিকিম	১.৭	-৪.৫
অরুণাচল প্রদেশ	১.৬	-৭.৫
নাগাল্যান্ড	২.৬	-৩২.৩
মণিপুর	২.০	-২৩.১
মিজোরাম	১.৯	-২৩.৮
ত্রিপুরা	১.৭	-১৫.৯
মেঘালয়	২.২	-২৫.১
আসাম	২.৩	-২০.৯
পশ্চিমবঙ্গ	১.৯	-১৩.৩
ঝাড়খণ্ড	১.১	৩.৫
ওড়িশা	০.৭	১১.৭
ছত্তিশগড়	-০.৪	২৩.২
মধ্য প্রদেশ	-০.১	১১.১
গুজরাট	০.২	৬.৮
মহারাষ্ট্র	০.৮	৪.৯
অন্ধ্র প্রদেশ	০.৫	৯.৯
কর্ণাটক	০.৯	৭.৭
কেরালা	১.১	-১.২
তামিলনাড়ু	০.৩	১৩.৮

সাত

২০০১-এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে, প্রথমে 'আন অ্যাডজাসটেড' তথ্য অনুসারে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি হারের পার্থক্য ছিল ১.৬ শতাংশ। 'অ্যাডজাসটেড' তথ্য আসার পরে দেখা গেল সংখ্যাটি নেমে হয়েছে ০.৯ শতাংশ। আমরা আগেই এ পি জোশি ও অন্যান্যদের লেখা 'রিলিজিয়াস ডেমোগ্রাফি অব ইন্ডিয়া' বইটির কথা বলেছিলাম। পাকিস্তান ও

বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যাকে ইচ্ছাকৃতাভাবে ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করে 'ইন্ডিয়ান রিলিজিওনিস্ট'রা (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্যরা, পরবর্তী পাঁচ দশকের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে বলে মতপ্রকাশ করা হয়েছিল উক্ত বইতে। জনসংখ্যা তত্ত্বের গৈরিকীকরণ ঘটাচ্ছেন নন-ডেমোগ্রাফাররা। ভারতে মুসলিমদের জনসংখ্যা যেহেতু হিন্দুদের তুলনায় অনেক কম তাই শতাংশের হিসেবে মুসলিম জনসংখ্যা সামান্য কিছু বৃদ্ধি পেলেও মোট সংখ্যার দিক থেকে তা হিন্দুদের মোট জনসংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য। ২০১১-র হিসেব মতো ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা ৯৬৬, ৩৭৮, ৮৬৮ জন ও মুসলিম জনসংখ্যা ১৭২, ২৪৫, ১৫৮ জন। শতাংশের হিসেব নিয়ে আলোচনার সময়ে মোট জনসংখ্যার বিষয়টিও স্মরণে রাখা দরকার। তাহলেই 'হিন্দুত্ববাদী জনসংখ্যা তাত্ত্বিক'রা যেভাবে ইসলামোফোবিয়া বানিয়ে তোলার চেষ্টা করে তা সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব। মুসলিম জনসংখ্যা এখন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা যদি নাও কমে, তাহলেও আগামী ৫০ বছরে মোট মুসলিম জনসংখ্যা মোট হিন্দু জনসংখ্যার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না।

গৈরিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে কথা বলার সময়ে শুধু হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যাবৃদ্ধির পার্থক্য বিষয়ে কথা বলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের রকমফের বিষয়ে গৈরিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিকরা পুরোপুরি নিশ্চুপ থাকেন। হিন্দুদের একটি বড় হোমোজিনিয়াস বা সমসত্ত্বধর্মী জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ডেমোগ্র্যাফিক বা জনসংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কেরালা অত্যন্ত উন্নত রাজ্য। কেরালাতেও হিন্দু নায়ারদের তুলনায় হিন্দু ব্রাহ্মণদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম। আবার লাতিন ক্রিশ্চিয়ানদের তুলনায় সিরিয়ান ক্রিশ্চিয়ানদের বৃদ্ধির হার কম। ঔপনিবেশিক পর্বের সূচনা থেকেই মাইক্রোলেভেলে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রত্যক্ষভাবে আইনগত বা সামাজিক ইনজিনিয়ারিং-এর দ্বারা সফলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। আর এই অনিয়ন্ত্রয়ণের ঘটনাটিকেই বড় করে দেখিয়ে মৌলবাদীরা তাদের স্বার্থসাধন করতে চায়।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করার আগে তাদের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি ছিল। কেরালার ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্বাধীনতার পরেও সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল দেশের গড় বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। (১৯৭১-এ ২.৩৩%, ১৯৮১-তে ১.৭৬%, ১৯৯১-তে ১.৩৩%, ২০০১-এ ০.৯১%, ২০১১তে ০.৭৪%।)

১৯৯১-২০০১-এ জাতীয় স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৯%, পক্ষান্তরে কেরালায় হার ছিল ০.৯১%। আবার ১৯৮১-৯১ ও ১৯১৯-২০০১-এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেমে এসেছিল প্রতি বছরে ৩.২% থেকে ২.৯%তে। এস ইরুদয়া রাজন EPW-তে (January 29,2005) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন : বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে বিগত ১০০ বছরের যেসব তথ্য রয়েছে (১৯০১-২০০১) সেগুলির তুলনামূলক বিচার করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। যেগুলি সাধারণভাবে গণমাধ্যমগুলিতে একেবারেই আসে না। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল মুসলিমদের তুলনায় বেশি। তারপর থেকেই মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের অতিক্রম করে যেতে থাকে। ১৯১১-২১-এ ইনফ্লুয়েনজা মহামারীর সময়ও ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শূন্য, হিন্দুদের বৃদ্ধিহার ছিল নেগেটিভ, কিন্তু মুসলিমদের বৃদ্ধিহার ছিল ০.১% প্রতি বছরে। স্বাধীনতার পরে উভয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। ১৯৪১-৫১তে স্বাধীনোত্তর ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ১.৮% কমে গিয়েছিল ও হিন্দু জনসংখ্যা ২.৪% বৃদ্ধি পেয়েছিল – দেশভাগ ও বিপুল সংখ্যক মানুষের পরিযায়ীতার কারণে। স্বাধীনতার পরের বছরগুলিতে হিন্দুদের বৃদ্ধি হার ছিল ২.০–২.২ শতাংশ প্রতি বছরে ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ২.৭–২.৮ শতাংশ প্রতি বছরে। ১৯৬১-১৯৯১-এর মধ্যে উভয়

সম্প্রদায়ের বার্ষিক বৃদ্ধিহার ছিল ২-এর বেশি। ১৯৮১-৯১ ও ১৯৯১-২০০১-এ হিন্দু (২.০ থেকে ১.৮) ও মুসলিম (২.৮থেকে ২.৬) উভয় সম্প্রদায়ের বার্ষিক বৃদ্ধিহার কমেছে একই পরিমাণে (০.২%)। ফার্টিলিটি ট্র্যানজিসনে মুসলিম সমাজ শুরু করেছে দেরিতে তাই এখনও তারা হিন্দু সমাজের পিছনে রয়েছে।

আবার একথাও মনে রাখা দরকার যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জন্মহার, মৃত্যু হার ও পরিযায়িতার সম্পর্ক রয়েছে। সারণি-৯ ও ১০-এ উক্ত তিনটি শর্তের বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে (ইরুদয়া রাজন)। সারণি-৯ থেকে, প্রতিবেশী দেশ থেকে হিন্দু ও মুসলিম পরিযায়িতার বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। যা সংঘ পরিবারের বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করে। পরিযায়িতার ফলে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ০.১৪% ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ০.২০%। গোটা দেশের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ০.২৫%। সংঘ পরিবারের বক্তব্য অনুসারে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুপ্রবেশ হচ্ছে ধরে নিলে মুসলিম জনসংখ্যা প্রতি বছরে ২.৪ -এর বদলে হচ্ছে ২.৬%। সুতরাং মুসলিম অনুপ্রবেশের জন্য হিন্দুরা ভারতে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে এমন ধারণা কমনসেন্স মাত্র। আবার সদ্যোজাত মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার হিন্দুদের মধ্যে বেশি ও মুসলিমদের মধ্যে কম (সারণি-১০)। পাশাপাশি একথাও মনে রাখা দরকার যে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, নেপাল, ভুটান মায়ানমার, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশ থেকে হিন্দু ও ক্রিশ্চিয়ান ধর্মাবলম্বীদেরও অনুপ্রবেশ ঘটছে। গৈরিক জনসংখ্যা তাত্বিকরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। (মুসলিমদের ক্ষেত্রে ০.২০% ও হিন্দুদের ক্ষেত্রে ০.১৪%।)

সারণি-৯

বিষয় : ১৯৯১-২০০১-এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি হার, পরিযায়িতা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিমাণ

ধর্মীয় গোষ্ঠী (১)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি (২)	ক্রুড বার্থ রেট (৩)	ক্রুড ডেথ রেট (৪)	স্বাভাবিক বৃদ্ধি (৫)= (৩)-(৪)	আন্তর্জাতিক পরিযায়িতার হার (৬)= (২)-(৫)	আন্তর্জাতিক পরিযায়ীতা না হলে বৃদ্ধি হার (৭)= (২)-(৬)
হিন্দু	১.৮২	২৪.৯	৮.১	১.৬৮	+০.১৪	১.৬৮
মুসলিম	২.৫৭	৩০.৮	৭.১	২.৩৭	+০.২০	২.৩৭
ভারত	২.০৩	২৫.৯	৮.১	১.৭৮	+০.২৫	১.৭৮

সারণি-১০

বিষয় : ভারতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সদ্যোজাত ও শিশুদের মৃত্যুহার

সূত্র ১৯৯১ সেন্সাস	সদ্যোজাতদের মৃত্যুহার		শিশুদের মৃত্যুহার	
	হিন্দু	মুসলিম	হিন্দু	মুসলিম
	৭৪	৬৮	৯৭	৯১
NFHS-1 1992-93	৯০	৭৭	১২৪	১০৬
NFHS-2 1998-99	৭৭	৫৯	১০৭	৮৩

আট

২০০৪-এর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেন্সাস ২০০১-এর ধর্ম বিষয়ক তথ্যগুলি প্রকাশের পরেই ৭ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোরে তখনকার বি জে পি সভাপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু দাবি করেছিলেন, সব গোষ্ঠীর জন্য অভিন্ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ সেন্সাসের তথ্যগুলি থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে তা দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি বলেছিলেন, হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধদের তুলনায় মুসলিম ও ক্রিশ্চিয়ানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এই অসাম্য অস্বাস্থ্যকর সব ধর্মের মানুষদের দুটি সন্তান হলে ইনসেনটিভ দেওয়া হোক ও তার বেশি হলে ডিসইনসেনটিভ দেওয়া হোক- এই ছিল তার দাবি। এ বিষয়ে তিনি জাতীয় বিতর্ক চেয়েছিলেন। তিনি উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ১.২ কোটি বাংলাদেশির অনুপ্রবেশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরেই সেন্সাস কমিশনার অ্যান্ড রেজিস্টার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া জে কে বান্থিয়া 'আন অ্যাডজাসটেড' তথ্যগুলি সংশোধন করে 'অ্যাডজাসটেড' তথ্যগুলি সামনে আনার পরেও বি জে পি'র বক্তব্যে বদল আসেনি। ঐ মাসেই দিল্লিতে বি জে পি মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্লেভে দাবি করা হয়েছিল সবধর্মের মানুষদের জন্য দুই সন্তানের নীতি বাধ্যতামূলক করা হোক। ১৬ই সেপ্টেম্বর (২০০৪) বি জে পি সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন, মুরলি মনোহর যোশীর নেতৃত্বে 'ডেমোগ্র্যাফিক ইনভেশন' বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে তুলে ধরবে। আর এস এস ওয়েবসাইটে ১৯শে সেপ্টেম্বর (২০০৪) বলা হয়েছিল আসামের তিনভাগের একভাগ মানুষ মুসলিম। তার ফলে আসামে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২০০১ -এর সেন্সাস রিপোর্টের তথ্য অন্য কথা বলে। (সারণি ১১)

বাংলাদেশ সংলগ্ন তিনটি রাজ্যে (আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ) মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার জাতীয় গড়ের কম অথবা সমান। (EPW, Jan. 29, 2005, ইরুদয়া রাজন)

সারণি-১১

বিষয় : বাংলাদেশ সংলগ্ন তিনটি রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (২০০১)

রাজ্য	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার %	হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার %	মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার %	হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য
আসাম	১.৭৩	১.৩৯	২.৫৭	১.১৮
ত্রিপুরা	১.৪৯	১.৩৯	২.৫৮	১.২০
পশ্চিমবঙ্গ	১.৬৪	১.৩৩	২.৩০	০.৯৭
ভারত	২.০৩	১.৮২	২.৫৭	০.৫৭

অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে ২০০০ সালে পার্লামেন্টে National Population Policy (NPP) গৃহীত হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে কায়রোর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এ বলা হয়েছিল : 'Development is the best pill'। ২০০০-এর NPP -তে এই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছিল। ভারত কায়রো ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারী। স্বাভাবিকভাবেই NPP-তে জনসংখ্যা নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য নন-কোয়েরসিভ (বলপ্রয়োগমূলক নয়) পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছিল। ইনসেনটিভ ও ডিসইনসেনটিভের বিরোধিতা করা হয়েছিল। নারীদের সামাজিক সূচকগুলির (সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার সহজলভ্যতা, কনট্রাসেপটিভ

ব্যবহারের সচেতনতা ইত্যাদি) বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল পপুলেশন কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এন পি পি সঠিকভাবে বলেছিল যে, দু'টি সন্তানের নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য বলপ্রয়োগ করা বা ইনসেনটিভ দেওয়া বা না দেওয়ার সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। সংঘ পরিবারের লোকজনরা বাজপেয়ীর সময়কার এন পি পি-র কথা ভুলেও আর উচ্চারণ করে না। পক্ষান্তরে 'ডেমোগ্র্যাফিক ইনভেশন' শব্দ দু'টি ব্যবহার করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চায়, যার সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগের কোনো সম্পর্ক নেই।

২০১১-র সেন্সাসের ধর্ম বিষয়ক তথ্যগুলি বিহার নির্বাচনের সময়ে (২০১৫) সামনে আনা হলো। তারপরেই আর এস এস-এর পক্ষ থেকে পুরানো দাবিগুলি আবার সামনে আনা হলো। ৩০শে অক্টোবর, ২০১৫ থেকে রাঁচিতে আর এস এস এক্সিকিউটিভদের সভা হয়ে গেছে। সেখানে 'religions of Bharatiya origin'-এর কথা বলে মুসলিম ও ক্রিশ্চিয়ানদের থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ হত্যাদিদের আলাদা করে দেখানো হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনার সূচনাতেই দেখিয়েছি এ পি জোশী ও অন্যান্যদের লেখা 'রিলিজিয়াস ডেমোগ্র্যাফি অব ইন্ডিয়া' (২০০৩) বইতে 'Indian Religionists' শব্দ দু'টি ব্যবহার করে একই প্রয়াস চালানো হয়েছিল। রাঁচিতে 'অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল' হিন্দু ও মুসলিমদের বৃদ্ধি হারের পার্থক্যের দু'টি কারণ হিসেবে বলেছেন : অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরকরণ। যার ফলে ধর্মীয় ভারসাম্যহীনতা দেখা দিচ্ছে। যা দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। অতীতের মতো এবারেও সংঘ সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলির কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছে। সেই কারণেই তারা ন্যাশনাল পপুলেশন পলিসি বা এন পি পি'কে পুনর্নির্মাণের কথা বলছেন। কারণ বাজপেয়ী সরকারের (এন ডি এ) গৃহীত এন পি পি আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত পদ্ধতি ও মাপকাঠির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও সংঘের মৌলবাদী অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে রয়েছে। ঐ এন পি পি চালু থাকলে সংঘ পরিবার যা চাইছে, তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। তাই তারা এন পি পি-র বদল চাইছেন।

২৫শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখে রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনার অব ইন্ডিয়া ২০১১-র সেন্সাসের ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যগুলি প্রকাশের পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া মুসলিম সমাজের ওপর দুই সন্তান নীতি বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেবার দাবি তুলেছিলেন। বি জে পি'র এম পি সাক্ষী মহারাজ তার কিছুদিন আগে প্রত্যেক হিন্দু নারীর চারটি করে সন্তানের জন্ম দেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেছিলেন। সংঘ পরিবারের এই দুই মুখ এই ধরনের কথা বলার অনেক আগেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে নরেন্দ্র মোদী যা বলেছিলেন তা মনে রাখার মতো। গুজরাট গণহত্যার সময়ে মোদী মুসলিমদের বিদ্রুপ করে বলেছিলেন 'হাম পাঁচ হামারা পঁচিশ'। রিলিফ ক্যাম্পগুলিকে বলছিলেন মুসলিমদের 'বেবি প্রেডিউসিং সেন্টার'। সঙ্ঘ পরিবার কমনসেন্সের মতো প্রচার করে মুসলিম মাত্রেই বহুবিবাহ করে ও প্রচুর সন্তানের জন্ম দেয়। বাস্তবে ১৯৬১-র সেন্সাস রিপোর্ট ও ১৯৭০-এর দশকের একটি সরকারি রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা বেশি। হিন্দুদের মধ্যে ৫.৮% ও মুসলিমদের মধ্যে ৫.৭%। (Front line, 2 oct 2015, page-10) পরবর্তী সেন্সাস রিপোর্টগুলিতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বহুবিবাহ বিষয়ক তথ্য আর দেওয়া হয় না। অনেক বিবাহিত হিন্দু পুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন একাধিকবার বিবাহের জন্য। ১৯৯৫-তে সুপ্রিম কোর্ট সরলা মুদগল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' মকোদ্দমায় এই ধরনের কাজকে বেআইনি বলে নির্দেশ দিয়েছিল। ২০০০-এর 'লিলি থমাস বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' মকদ্দমায় উক্ত রায়কে সমর্থন জানানো হয়েছিল। এই দু'টি রায়-এর

লেবারের নেতৃত্বে করবিন

শান্তনু দে

'লেবার পার্টি থেকে ব্রিটিশ সংসদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমায় বলতেই হবে, ইরাকে বুশের যুদ্ধে ব্রিটিশদের যুক্ত হওয়া নিয়ে সেখানে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিরোধিতা আছে। কারণ আমরা জানি কেন এই যুদ্ধ। এটা শান্তির জন্য নয়। গণতন্ত্রের জন্য নয়। ন্যায়বিচারের জন্য নয়। এই যুদ্ধ তেলের জন্য। এই যুদ্ধে সবচেয়ে লাভবান হবে অস্ত্র-কারবারিরা। যারা বহুদিন ধরে বহু মানুষের দুর্দশার বিনিময়ে বহু কিছু গুছিয়ে নিয়েছেন।

আমরা এখন বিশ্বের ধনীশ্রেষ্ঠ দেশগুলির একটিতে। আমি নিজেও বিশ্বের একটি ধনী দেশের প্রতিনিধি। আমরা সবাই যদি একসঙ্গে বিশ্বের হতদরিদ্র প্রান্তের চরম দারিদ্র্যে থাকা মানুষের জন্য বলতে পারি, যারা পানীয় জলের ঘাটতি, স্বাস্থ্যের সংকট, এইডসের মহামারি-সহ নানা অবিচারের শিকার, যদি আমরা সমস্ত সমরাস্ত্রের ধ্বংস ও যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারি, ছত্রাকের মতো ছড়িয়ে পড়া সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে পারি– তবে একটি বিশ্ব– একটি শান্তির বিশ্ব তৈরি করা সম্ভব। ক্যাপিটলের প্রতি, হোয়াইট হাউসের প্রতি, ডাউনিং স্ট্রিটের প্রতি এবং সবার প্রতি এটাই আমাদের বার্তা। সরে আসুন! সেনাবাহিনীকে ঘরে ফিরিয়ে আনুন। ফিরিয়ে আনুন শান্তি। তেলের জন্য আর কোনও যুদ্ধ নয়।'

জানুয়ারি, ২০০৩। ওয়াশিংটন। যুদ্ধ-বিরোধী সমাবেশ।

'সমস্যা হলো, আইসিসের সরবরাহ করা তেল যাচ্ছে তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে। আমি মনে করি, আমাদের নির্দিষ্টভাবে জানা দরকার– কারা এই তেল নিচ্ছে, কারা এই তেলের জন্য অর্থ জোগাচ্ছে, কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক অর্থ লেনদেনের কাজে যুক্ত যাতে শেষ পর্যন্ত লাভবান হচ্ছে আইসিস, এই অঞ্চলে আর কোন্ দেশ এতে জড়িত, কিংবা জড়িত নয়।'

ডিসেম্বর, ২০১৫। ব্রিটিশ সংসদের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্স। সিরিয়ার আইসিসের বিরুদ্ধে বিমান হানা নিয়ে বিতর্কে। (রাশিয়া তথ্য-প্রমান সহ ফাঁস করে দিয়েছে আইসিসের তেল যাচ্ছে তুরস্কের শোধনাগারে। সিরিয়া, ইরাকের তেলের এই বেআইনী কারবারে ফায়দা তুলছে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরিবার)।

●

তিরিশ বছরে এই প্রথম লেবার পার্টি হতে চলেছে একতরফা পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে। এই প্রথম লেবার নির্বাচিত করেছে এমন একজন নেতাকে, যিনি ব্রিটেনকে বের করে আনতে চান মার্কিন মদতপুষ্ট সামরিক জোট ন্যাটো থেকে। আফগানিস্তান, ইরাক থেকে সিরিয়া– যিনি সমস্ত যুদ্ধের বিরোধী।

নির্বাচনী ভূকম্পন ব্রিটেনের লেবার পার্টিতে। বি বি সি'র ভাষায় 'রাজনৈতিক ভূকম্পন'। ব্রিটিশ-পাকিস্তানি রাজনৈতিক ভাষ্যকার, নিউ লেফট রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক তারিক আলি বলেছেন, 'রাজনৈতিক গণ-অভ্যুত্থান।'

স্বাভাবিক। বরাবর বামপন্থী ও যুদ্ধ-বিরোধী অবস্থানে স্থিত থাকা লন্ডনের আইলিংটন নর্থ থেকে

সাতবার জেতা সাংসদ জেরিমি করবিন দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন প্রায় ৬০শতাংশ ভোট পেয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী তিন প্রার্থীকে পরাস্ত করে। ব্রিটিশ গার্ডিয়ান পত্রিকা করবিনকে লেবার পার্টির 'ইতিহাসে সবচেয়ে বামপন্থী ও প্রতিষ্ঠান-বিরোধী নেতাদের অন্যতম' বলে বর্ণনা করেছে।

ফ্রান্সের সোস্যালিস্ট পার্টির প্রাক্তন সম্পাদক জ্যাঁ ক্রিস্টোফো ক্যামবাদেলিস বলেছেন: 'সোস্যাল ডেমোক্রেটিক বৃত্তে জেরেমি করবিন এবং টম ওয়াটসন (লেবার পার্টির নবনির্বাচিত সহকারী নেতা)-কে স্বাগত, যাঁদের রুখে দাঁড়ানো উচিত ইউরোপীয় কনজারভেটিভদের বিরুদ্ধে।'

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পিঁয়ের লঁরে বলেছেন: 'এটি দেখালো ইতিহাসের চাকা নতুন মোড় নিচ্ছে। ঘটনা হলো এটি ঘটলো এমন এক দেশে, এমন একটি দলে, যা সোস্যাল ডেমোক্রেসির নতুন মডেল হিসেবে ব্লেয়ার-বাদকে প্রতিনিধিত্ব করে। ভালো, এখন ঘটনা এগোচ্ছে পূর্ণ বৃত্তের দিকে।'

সাইরিজা বলেছে, লেবার পার্টির নেতা হিসেবে করবিনের জয় 'একটি আশার বার্তা।'

ফরাসী লেফট পার্টির সম্পাদক এরিক কোকুয়েরেলের কথায়, 'থ্যাচার, ব্লেয়ারের দেশে ফিরে এল প্রকৃত বামপন্থা। এটা দেখালো ফ্রান্সেও একই সম্ভাবনা রয়েছে। এবং শেষে জয়।'

'কোনও সন্দেহ নেই, ১৯৮৮'র কেইর হার্ডির থেকে লেবর পার্টির ইতিহাসে করবিনই প্রথম সোস্যালিস্ট নেতা।' বলেছেন ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রবার্ট গ্রিফিথস। 'জর্জ ল্যান্সবারি, কিংবা মাইকেল ফুট এক ধরনের সোস্যালিস্ট ছিলেন বলে দাবি করা যেতে পারে, তবে তাঁরা কেউই স্টপ-গ্যাপের বেশি কিছু ছিলেন না। মাইকেল ফুট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাতেও তেমন আগ্রহী ছিলেন না।'

ইতিহাসের কৌতুক কখনও ব্যর্থ হয়নি চমক দিতে। তা সে যে মাপকাঠিতেই মাপা হোক। করবিনের জয় তেমনই। যিনি মনে করেন যারা বিদেশে ধ্বংস অভিযানে নামেন, তারা দেশে ভালো কিছু করতে পারেন না। তিনি সংসদের মধ্যে কট্টর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিনিধি। বলেছেন তারিক আলি।

কেইর হার্ডির 'সমাজতন্ত্র' হোঁচট খেয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে। কেনসীয়বাদী ক্লিমেন্ট এটলি দেশে অনেক সংস্কার করলেও, বিদেশে তাঁর সরকার অনুমোদন করে হিরোশিমা, নাগাসাকির বিস্ফোরণকে। আফ্রিকা, এশিয়ার অনেক দেশই এটলির ব্রিটেনকে মনে রেখেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে। যেমন মালয়েশিয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে এটলির দশকভর যুদ্ধ, হাজারো মৃত্যু। এটলির প্রশাসনই ব্রিটেনকে নিয়ে গিয়েছিল কোরিয়া যুদ্ধে। এটলির বিদেশসচবি আর্নেস্ট বেভিন ছিলেন ন্যাটোর অন্যতম স্থপতি। হ্যারল্ড উইলসন সম্পদের পুনর্বন্টনে পদক্ষেপ নিলেও সমর্থন করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধকে। বিরোধী নেতা হিসেবে মাইকেল ফুট ছিলেন মার্গারেট থ্যাচারের ফকল্যান্ড ফিরে পাওয়ার যুদ্ধের পক্ষে।

অন্যদিকে করবিন: ২০১১, লিবিয়ায় ন্যাটোর আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছিলেন। সেইসঙ্গেই তিনি ইউক্রেনের উপর সাম্প্রতিক আচরণের বিরোধী। ২০০৬, লেবাননের উপর ইজরায়েলী হামলা এবং ২০০৮ ও ২০১৪তে গাজায় বোমাবর্ষনের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। ২০০১, আফগানিস্তানে যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী জোটের ব্রিটেন শাখার সভাপতি। এবং তিনি ছিলেন ওই যুদ্ধের বিরোধী। ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে লন্ডনে যে ২০লক্ষ মানুষের মিছিল হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার সামনের সারিতে। ওসামা বিন লাদেনের হত্যার সমালোচনা করে বলেছিলেন, তাকে বিচারের মুখোমুখি করা উচিত ছিল। সেপ্টম্বরের ১২তারিখ, লেবার পার্টির নেতা নির্বাচিত হয়েই তিনি সংসদ ছেড়ে বেরিয়ে যোগ দেন ৫০,০০০মানুষের এক উদ্বাস্তু সমাবেশে। সংসদে কতিপয় লেবর সদস্যদের মধ্যে তিনি একজন, যিনি ধারাবাহিকভাবে সমস্ত বেসরকারীকরণের বিরোধিতা করেছেন। ব্যয়সঙ্কোচের সমস্ত শ্রমিক-বিরোধী পদক্ষেপ থেকে দলকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন।

জেরেমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। রাজতন্ত্রে নন। তাই রাণীকে এড়িয়ে চলেন। রাণী দীর্ঘজীবী হোন এমন জাতীয় সংগীতে গলা মেলান না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

করবিন পূর্বসূরী এড মিলিব্যান্ড নিজেও একটু বামদিকে ঝুঁকেছিলেন। অন্তত পিতৃপরিচয়ে তো বটেই। এডের বাবা রাল্ফ মিলিব্যান্ড ছিলেন একজন সোস্যালিস্ট বুদ্ধিজীবী। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। নিজের ভাই, ব্লেয়ারের ভাবশিষ্য ডেভিড মিলিব্যান্ডের সঙ্গে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এড জিতলেও দলকে গুছিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু, করবিনের জন্য জমি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন।

পরবর্তী নির্বাচন ২০২০তে। প্রধান বিরোধী দলের নেতা হিসেবে জেরেমি এখন ছায়া মন্ত্রিসভার প্রধান। শাসলদল কনজারভেটিভ পার্টি এবং দক্ষিণপন্থী ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গে এখন তাঁর লড়াই।

করবিনের নির্বাচন কনজারভেটিভ ও সাম্প্রতিক লেবার সরকারের শ্রমিক-বিরোধী ব্যয়সংকোচের নীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণী এবং তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাঘাত। করবিনের জয়– ১৯৮০তে লেবার পার্টিতে যে দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের শুরু এবং ১৯৯৪তে টনি ব্লেয়ারের নেতা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যা নেয় চূড়ান্ত চেহারা– তার প্রতিস্রোত। দুনিয়ার সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মতোই গত তিরিশ বছরে লেবার পার্টি দক্ষিণ থেকে সরেছে আরও দক্ষিণে। আলিঙ্গন করেছে নয়া উদারবাদ ও মুক্ত বাজারের অর্থনীতিকে। ব্লেয়ার/ব্রাউন-সহ অন্যান্য নেতারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এই দক্ষিণপন্থী ঝোঁককে। বস্তুত, ব্লেয়ার থেকে করবিনের আগে পর্যন্ত– লেবার পার্টি (ব্লেয়ার যাকে বলেন নব্য-লেবার) সরাসরি সওয়াল ও দালালি (১৯৯৭থেকে ২০১০পর্যন্ত) করে গিয়েছে মুক্ত বাজার, ব্যয়সঙ্কোচ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বাধীনতার পক্ষে। যাকে সমস্ত দক্ষিণপন্থী দল কোনও প্রশ্ন ছাড়াই সমর্থন করেছে। এই পরিস্থিতিতে স্বঘোষিত 'গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্রী' এবং একজন 'মার্কসের ভক্ত' করবিনের জয় গুরুত্বপূর্ণ।

লেবার পার্টির বাইরে গণ আন্দোলন জেরিমি করবিনকে নিয়ে এসেছে দলের ক্ষমতার কেন্দ্র। সংসদে দলের সদস্যদের ১০শতাংশের সামান্য বেশি সমর্থন সত্ত্বেও তিনি পেয়েছেন আড়াই লক্ষ (৫৯.৫শতাংশ) ভোট। করবিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেবারের সমর্থনে এনেছে নতুন স্রোত। মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর থেকে সদস্য সংখ্যা বেড়ে এখন প্রায় দ্বিগুণ। ব্যয়সঙ্কোচ, যুদ্ধ, জনকল্যাণ খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই এবং পরমাণু অস্ত্রের বিরোধিতার মঞ্চ থেকে করবিনের জয়ের পরের সপ্তাহে দলে যোগ দিয়েছেন প্রায় ৬০,০০০মানুষ।

৭মে, সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির ভরাডুবির পরের দিনই পদত্যাগ করেন দলের নেতা এড মিলিব্যান্ড। জরুরি হয়ে পড়ে দলের নেতা নির্বাচন। নির্বাচন হয় ১০সেপ্টেম্বর। ফল ঘোষণা ১২ সেপ্টেম্বর।

১৯৮৩থেকে করবিন সাংসদ। ৬৬-বছরের এই লেবর নেতা কখনও ছিলেন না সরকারে কিংবা ছায়া মন্ত্রিসভায়। বরাবরই দলের অবস্থানের বিরোধী। ব্যাকবেঞ্চার। ১৫জুন মনোনয়ন পেশের আগে পর্যন্ত ছিলেন একেবারেই অপরিচিত, অচেনা। কেউই আশা করেননি করবিন জিতবেন। এমনকি তিনি নিজেও নন। চার দশকের বন্ধু তারিক আলি পর্যন্ত তাঁর জয়ের জন্য ১০-২০পাউন্ডও বাজি ধরতে রাজি ছিলেন না। শেষে কোনও মতে সমর্থন জোগাড়ে সমর্থ হন, যখন কয়েকজন সাংসদের মনে হয় দলের 'বামপন্থী প্রতিনিধি' প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া নির্বাচন একেবারেই একতরফা হয়ে যাবে। তাঁদের মধ্যে অনেকে অবশ্য দ্রুতই নিজেদের সিদ্ধান্তের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।

এই পরিস্থিতিতে করবিন শুরু করেন তাঁর প্রচার। টেলিভিশন, রেডিওতে সহজ-সরল ভাষায় বলেন ব্যয়সংকোচ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সম্পদের পুনর্বন্টন, সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছাঁটাই, রেলসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনর্জাতীয়করণ, মহিলাদের অধিকার, ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্বাস্তুদের অধিকারের পক্ষে। যা প্রতিধ্বনিত হয় লেবার-সমর্থকদের মধ্যে। বিপরীতে, করবিনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কেউই ব্যয়সংকোচের বিরোধিতা করেননি। কেউই ভোট দেননি কল্যাণকর খাতে টোরি সরকারের সাম্প্রতিক আঘাতের বিরুদ্ধে। করবিনের বক্তব্য আলোড়ন ফেলে দেয় ব্রিটেনে। বিশেষত, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। হাজার-হাজার যুবক যুবতী যোগ দেন করবিনের সমাবেশে, মিছিলে। নেতৃত্বের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ লেবার পার্টি সদস্য অথবা সমর্থক হিসেবে যোগ দেন।

ইংল্যান্ড দেখে স্কটিশ উত্থানের ইংরেজি সংস্করণ– বছরের গোড়ায় যে ঝড় তুলে লেবারের শক্ত ঘাঁটিতে বিপুল ভোটে জিতেছিল স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি। লেবার জিতেছিল মাত্র একটি আসনে। ব্যয়সঙ্কোচের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেওয়ায় লেবারের সমর্থনের ভিতে ফাটল ধরায় স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি। স্কটিশ বিদ্রোহ এখন ইংল্যান্ডে।

বছরকয়েক আগে লেবার পার্টি তার নেতা ও উপনেতা নির্বাচনে বিধি পরিবর্তন করে। দলের সদস্য এ সমর্থকদের সরাসরি তাদের নেতা নির্বাচনের সুযোগ করে দেয়। এককালীন ৩পাউন্ড দিলে যে কেউ দলের নেতৃত্ব নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বুঁদ ব্লেয়ারবাদীরা ভেবেছিলেন, আভ্যন্তরীণ নির্বাচনকে সাধারণ জনগণের মধ্যে খুলে দিলে দলে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য এবং শ্রমিকদের শক্ত ঘাঁটির প্রভাবকে গুড়িয়ে দেওয়া যাবে। লক্ষ্য ছিল দলের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের ভিতকে দুর্বল করা। কিন্তু হিতে-

বিপরীত হয়। ৩পাউন্ডের প্রস্তাব মেনে নেয় দলের 'বামপন্থী' অংশ। ব্লেয়ারবাদীদের নতুন পদ্ধতি তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা যাবে দেখে তাঁরা এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। এবং এই পদ্ধতি সোস্যাল মিডিয়ার জন্য যথার্থ– যাতে এক ক্লিকেই যে কেউ 'সাইন আপ' (সই) করতে পারেন এবং তাঁদের বন্ধুদের একইভাবে তা করার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন– যার সদ্ব্যবহার করেন করবিন, যিনি ফেসবুক ও টুইটারের জোরালো সমর্থক। এবং শেষে নাটকীয় প্রত্যাঘাতের জন্ম।

করবিনের সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন সমাজের সব বয়েসের সব স্তরের মানুষ। তবে চোখে পড়ার মতো রয়েছে অন্তত তিনটি বিভাজন। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন তরুণরা। যাঁরা ২০০৮-উত্তর নয়া উদারবাদী জমানায় তুমুল অনিশ্চয়তার শিকার। উচ্চশিক্ষিত, অথচ হয়তো কাজ করছেন কফিশপে। করবিনের সমাবেশে তরতাজা নতুন মুখ দেখে তাই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ২০১২'র বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনগুণ বেতন বৃদ্ধি তাদের রাজনীতিতে টেনে এনেছে। তাঁর সমর্থকদের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন। ক'দিন আগে পর্যন্ত করবিন ছিলেন স্টপ দি ওয়ার কোয়ালিশনের সভাপতি, ২০০৩সালে ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা সংগঠিত করেছিল ব্রিটিশ ইতিহাসের বৃহত্তম প্রতিবাদ সমাবেশ– ২০লক্ষ মানুষের মিছিল। এই সমাবেশের উত্তরাধিকার প্রভাব ফেলেছে করবিনের প্রচারে। বিপুল সংখ্যার সেই মানুষ, যারা নব্য-লেবারে বীতশ্রদ্ধ, যাঁরা ব্লেয়ারের বিরোধী, তাঁরা ফিরে এসেছেন, সমর্থন করেছে করবিনকে। তৃতীয় গোষ্ঠীটি হলো সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্তে যেখানে এখনও রীতিমতো দাপট রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের, যেখানে বছরের পর বছর বেতন দাঁড়িয়ে রয়েছে একই জায়গায়, ছাঁটাই করা হচ্ছে পরিষেবা, হচ্ছে বেসরকারীকরণ, সেখানে শ্রমিকরা এসে দাঁড়িয়েছেন করবিনের পাশে। তৃণমূল স্তরে চাপের মুখে বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন ইউনাইট অ্যান্ড ইউনিসন পর্যন্ত করবিনকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়।

২০২০'র নির্বাচনে যাই প্রভাব ফেলুক না কেন, করবিনের জয় খুলে দিয়েছে ব্যয়সংকোচ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের চাহিদা এবং প্রতিবাদ-সমাবেশের সম্ভাবনার দুয়ারকে।

মানুষ যে বিরক্ত হতাশ, ব্রিটেনেই তার প্রথম প্রকাশ নয়। ভোটের পরিবর্তনে এই অসন্তোষের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে স্পেন, তুরস্ক, গ্রিস, পর্তুগাল, স্কটল্যান্ডে।

স্পেন– ব্যয়সঙ্কোচ-বিরোধী নতুন দল পোডেমস ২০১৪'র নির্বাচনে পেয়েছে ৮শতাংশ ভোট। ভবিষ্যতে আরও বেশি পাওয়ার রয়েছে প্রবল সম্ভাবনা।

তুরস্ক– বামপন্থী ও কুর্দিপন্থী শক্তিগুলির জোট পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (এইচ ডি পি) এই প্রথম তুরস্কের সংসদে। এই প্রথম সংসদে প্রতিনিধিত্ব। কারণ, তুরস্কের সংবিধান অনুযায়ী অন্তত ১০শতাংশ ভোট না পেলে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা যায় না।

গ্রিস– এই মুহূর্তে অবধারিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জানুয়ারির নির্বাচনে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট সাইরিজার জয়।

পর্তুগাল– দক্ষিণপন্থী সরকারকে হটিয়ে নতুন সরকার পর্তুগালে। কমিউনিস্ট পার্টি, লেফট ব্লক, গ্রিনদের সমর্থনে সোস্যালিস্ট পার্টির সরকার। অক্টোবরের নির্বাচনে বামপন্থীদের ভোট ও আসন দুই-ই বেড়েছে। পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক ঐক্য কোয়ালিশন পেয়েছে ১৭টি আসন। ৮.৭শতাংশ ভোট। সংখ্যার হিসেবে ৪,৪৪,৩১৯জনের সমর্থন। ১৯৯৯সালের পর থেকে সবচেয়ে ভালো ফল।

স্কটল্যান্ড– মে'র নির্বাচনে ৫৯টি আসনের মধ্যে ৫৬টিতে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির জয়, যার অনেকটাই আসে ব্রিটিশ লেবার পার্টির ব্যয়সঙ্কোচ-মুখী অবস্থানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ থেকে। এবং যা সাম্প্রতিকতম পরিবর্তনের অগ্রদূত।

মার্কিন মুলুকে করবিনের জয়কে তুলনা করা হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে বার্নি স্যান্ডার্সের অপ্রত্যাশিত সফল প্রচারাভিযানের সঙ্গে। দু'জনের মিল এক জায়গায়। দু'জনেই নয়া উদারবাদ, অসাম্য এবং ব্যয়সংকোচের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের লাভ তুলতে সফল। তবে একজন রাজনৈতিক প্রার্থী হিসেবে করবিনের অবস্থান বামপন্থার প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ। বিশেষত, বিদেশনীতির প্রশ্নে। নতুন লেবার নেতা যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। এবং প্যালেস্তিনীয় অধিকারের প্রশ্নে সরব। স্যান্ডার্স তা নন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ইজরায়েলকে সমর্থন থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনের প্রতি নিস্পৃহতার মতো নিজস্ব ত্রুটিবিচ্যুতির শিকার।

কনজারভেটিভ পার্টি ইতোমধ্যেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। করবিনকে 'জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে

বিপজ্জনক' বলে বর্ণনা করেছে। করবিনের জয়ের দিনই প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের ট্যুইট: 'লেবার পার্টি এখন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং আপনাদের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক।'

কনজারভেটিভদের এই আক্রমণ আসলে তাঁদের আতঙ্কের লক্ষণ। যার নেপথ্যে রয়েছে– লেবারের নেতৃত্বের এই পরিবর্তন আসলে ব্রিটেনের মানুষের মেজাজের পরিবর্তন। এর অর্থ শ্রমিক, বিশেষত তরুণরা মূল ধারার রাজনীতি সম্পর্কে হতাশ। সঙ্কটের সমাধানে তাঁরা বেরিয়ে আসতে চান বাইরে।

করবিন প্রধানমন্ত্রী হলে সেনাবাহিনীর থেকে 'বিদ্রোহের' মুখে পড়বেন বলে হুঁশিয়ারি শুনিয়েছেন এক সেনাকর্তা। সামরিক খাতে খরচ কমানো এবং ন্যাটো থেকে বেরিয়ে আসা নিয়ে উদ্বেগ ক'দিন বাদে যখন আরও সংক্রামিত হয়, তখন নাম প্রকাশ না করার শর্তে সেনাবাহিনীর এক পদস্থ কর্তা সানডে টাইমস পত্রিকাকে বলেন, 'তাহলে সবস্তরে হবে গণ পদত্যাগ এবং আপনি বিদ্রোহের একটি সত্যিকারের সম্ভাবনার মুখোমুখি হবেন।' অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিরক্ষামন্ত্রক তার নিন্দা করে। দলের ভিতরেও বিরোধিতার মুখে করবিন। লেবারের ২৩২জন সাংসদের অনেকেই তাঁর ছায়া মন্ত্রিসভায় থাকবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। যা তাঁর নেতৃত্বকে খর্ব করার ইঙ্গিত।

এখন লেবারে আছেন একজন 'বামপন্থী' নেতা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় লেবর রাতারাতি কোনও বামপন্থী দলে পরিণত হয়ে গিয়েছে। দলের সাংসদ, নেতাদের অধিকাংশই এখনও নয়া উদারবাদী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষে। ব্লেয়ারবাদী। করবিন চাইলেই রাতারাতি তাঁর দলকে নিজের মতো করতে পারবেন না। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হবে।

করবিনকে সফল হতে হলে তাঁকে লেবরের সদস্যদের একজোট করতে হবে। সংসদের বাইরে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে তুফান তুলতে হবে। নেতা নির্বাচিত হয়েই তিনি উদ্বাস্তুদের অধিকারের সমর্থনে ভাষণ দিয়েছেন। এটা ভালো লক্ষণ। কিন্তু তাঁকে যেতে হবে বহু দূরে। করবিনের জয়ে তৈরি হয়েছে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা। কিন্তু তা এখনও এজন্য জরুরি কার্যকরী সংগঠন নির্মাণে প্রতিফলিত হয়নি।

প্রশ্ন উঠছে তিনি, তাঁর নেতৃত্ব লেবার কি পরবর্তী নির্বাচনে জিতবে? তাঁর বিরোধীরা বলছেন, পারবেন না। এবং এটি হবে লেবারের জন্য বিপর্যয়, আত্মহত্যা। কিন্তু ব্রিটেনের মেজাজ বলছে অন্য হাওয়ার কথা।

যেদিন করবিন নির্বাচিত হয়েছেন, সেদিন শুধু একদিনেই সাড়ে ১৪হাজার মানুষ লেবার পার্টিতে নতুন করে যোগ দিয়েছেন। তিনি যেভাবে লেবার ঘাঁটিকে উৎসাহিত করেছেন, দীর্ঘ সময়ে তার নজির নেই।

ব্লেয়ার যুদ্ধবাজ। ব্রাউন নিও লিবারেল। করবিন তাকে ভাঙতে চান। কতটা পারবেন, বলবে সময়।

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রবার্ট গ্রিফিথস বলেছেন, 'এক ঐতিহাসিক ও নির্ণায়ক মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয়েছে লেবার পার্টিতে, শ্রমিক ও প্রগতিশীল আন্দোলন এবং সামগ্রিকভাবে জনগণের মধ্যে। এটি এমনই এক সংগ্রাম, যাতে বামপন্থীদের প্রত্যেকেরই অংশগ্রহণ করা উচিত। লেবার নেতা হিসেবে করবিনের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এটা শুরু হয়নি। তবে কোনও ভ্রান্তি না রেখেই বলা যায়, তাঁর জয় দেখিয়েছে আমাদের সমাজের মৌলিক পরিবর্তন এবং আরও উন্নত সমাজের লক্ষ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে।

করবিনের এই উত্থান শুধু তাঁর ব্যক্তিগত, কিংবা তাঁর সমর্থকদের জয় নয়। এই জয় জনপ্রিয় প্রতিবাদ এবং গণসমাবেশের জয়– যাকে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছিল 'সেকেলে', প্রান্তিক অথবা নিরর্থক। যে ২,৫১,০০০মানুষ করবিনকে নির্বাচিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এর মাধ্যমে ব্যয়সংকোচ, বেসরকারীকরণ, বেডরুম ট্যাক্স এবং ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতায় এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিলেন। আঁদের অধিকাংশই সেই ১,০০,০০০'র বেশি লেবার পার্টির নতুন সদস্য, যাঁরা ভোট দিয়েছেন সেই প্রার্থীকে, যিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পিপলস অ্যাসেম্বলি, সি এন ডি, স্টপ দি ওয়ারের মতো আন্দোলনের সঙ্গে। টোরির জনকল্যাণ সংস্কার বিলে ভোট দেওয়ার জন্য লেবরের হুইপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সাড়া দিয়েছেন তাঁরা। গত চার বছরে ব্রিটেন দেখেছে কাজ, পেনশন এবং জন পরিষেবা রক্ষার পাশাপাশি সরকারী ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ সমাবেশের উত্থান। এই শ্রমিকদের অনেকেই ৪১,০০০নথিভূক্ত সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন, যাঁরা ভোট দিয়েছেন করবিনকে।

এভাবেই আমরা দেখলাম, সংসদ-বহির্ভূত আন্দোলন ও শিল্পে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংসদীয় ও আন্তদলীয় সংগ্রামের মিশেল কীভাবে গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে পারে।'

এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি, কলকাতা-৭৩, ● ২, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২

শাখা : বিধাননগর, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

● e-mail : nba.pvltd@gmail.com ● Fax : 2334 2769